উত্তর গ্রামচরিত

শিশির মজুমদার

প্রকাশক ॥
শ্রীঅরুণকান্তি ঘোষ
৫১, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট,
কলিকাতা—৭০০০০৯

প্রচ্ছদ ॥
প্রণবেশ মাইতি

প্রকাশকাল ॥
১ বৈশাখ ১৩৭২

মুদ্রক ॥
জানা প্রিন্টিং কনসার্ন
কলিকাতা—৭০০০১২

উৎসর্গ

উত্তরবঙ্গের আদৃত-অনাদৃত

লোকশিল্পীদের।

উত্তরবঙ্গ লোকযানের সৌজন্যে

পত্র ॥ শিশির মজুমদারকে আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ॥

CALCUTTA

SUNITI KUMAR CHATTERJI
NATIONAL PROFESSOR OF INDIA
IN HUMANITIES

NATIONAL LIBRARY CAMPUS
CALCUTTA

I know personally Professor Sisir Majumdar M.A. of Raiganj College in West Dinajpur District in West Bengal, and I have been very much impressed by the serious interest with which he has taken up the study of folk culture and folk literature of the area. He is well qualified to start research work in this subject, as he is an M.A. in Bengali language and literature. He has been doing field work in collecting materials in folk poetry and folk-lore as well as in popular religion and popular cults and rites and rituals, which are fast disappearing from our rural masses with the ever growing urbanisation and sophistication that are transforming the people everywhere through the operation of the Time Spirit. I am glad to find that his preliminary enquiries have brought to our notice some popular cults and popular types of literary expression of these cults which were hitherto not known to scholars, like e.g., the Kash ba (or Karsha-vrata — a harvest festival), and certain types of cult songs. Sri Majumdar is not sparing himself in his attempts to collect his material, taking great pains to go to out of the way places in far-away villages which are difficult of access, meeting likely informants and witnessing and taking notes of ceremonies and village gatherings of a religious nature connected with these cults. I think Sri Sisir Majumdar fully deserves all help and support from our Universities and our Government institutions like the University Grants Commission. We look forward to have really good work from him.

Suniti Kumar Chatterji

I know personally Professor Sisir Majumdar M. A. of Raiganj College in West Dinajpur District in West Bengal, and I have been very much impressed by the serious interest with which he has taken up the study of folk culture and folk-literature of the area. He is well qualified to start research work in the subject, as he is an M.A. in Bangali language and literature. He has been doing field work in collecting materials in folk-poetry and folk-lore as well as to popular religion and popular cults and rites and rituals, which are fast disappearing from our rural masses with the ever growing urbanisation and sophistication that are transforming the people every where through the operation of the time spirit. I am glad to find that his preliminary inquiries have brought to our notice some popular cults and popular types of literary expression of these cults which were hitherto not known to scholars, like, eg., the Kash-ba (or Karshavrata—a harvest festival), and certain types of cult songs. Sri Majumdar is not sparing himself in his attempts to collect his materials, taking great pains to go to out of the way places in far-away villages which are difficult of access, meeting likely informants and witnessing and taking notes of cerimonies and village gatherings of a religious nature connected with those cults. I think Sri Sisir Majumdar fully deserves all help and support from our University and our government institutions like the University Grants Commission. We look forward to have really good work from him.

Suniti Kumar Chatterji.

কল্যাণভাজনেষু,

আজ জামশেদপুর থেকে ফিরে এসে তোমার চিঠি পেলাম। প্রদ্যোতের একটি অনুষ্ঠান উপলক্ষে মালদহ গিয়েছিলাম, সেখানে সে তার ছাত্রছাত্রী সহকর্মীদেব নিয়ে আমাকে কেন্দ্র করে একটি ছোট্ট অনুষ্ঠান করেছিল তা আমার প্রকৃত জন্মদিন ছিল না তবু অনুষ্ঠানটি তেমনই ধরনের একটা কিছু করে তুলেছিল। তা' তোমাদের জানানোর মত কিছু ছিল না।

তুমি উত্তর বাংলার অবহেলিত অঞ্চলের লোক-সংস্কৃতি নিয়ে কেবলমাত্র নিজের প্রেরণায় যে কাজ ক'রে যাচ্ছ, তা বাস্তবিকই প্রশংসারযোগ্য। সেইজন্যে শুনে প্রকৃতই আনন্দিত হয়েছি যে তোমার অনুসন্ধানের ফলগুলো আজ সর্বস্তরেই স্বীকৃতি লাভ করতে আরম্ভ করেছে। পশ্চিম দিনাজপুর জিলার কাঠের মুখোস কিংবা পাটের কার্পেট এ সব জিনিস চোখে দেখা দূরে থাক, তাদের বিষয় কেউ কানেও শোনেনি, সেই অবস্থায় তুমি তাদের সন্ধান করে এনে লোকচক্ষুর সামনে উপস্থিত করছ এবং সরকারী পুরস্কারে শিল্পীদের অভিনন্দিত করবার সুযোগ ক'রে দিয়েছ, এমন কাজ এদেশের খুব বেশী লোক করতে পারেনি। উত্তর বাংলার অনেক কিছুই আমরা জানি না, এই না-জানাই উত্তর বাংলার সঙ্গে আমাদের একটা ব্যবধান সৃষ্টি করেছে। তুমি তোমার পরিশ্রম এবং জ্ঞানবুদ্ধি দিয়ে সেই ব্যবধান দূর করে দিতে ব্রতী হয়েছ, এ'জন্য তুমি জাতির কৃতজ্ঞতাভাজন হয়ে থাকবে।

তুমি সবাই 'মিলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করবার কথা বলেছ। তা যদি হতে পারত তা হলে ত কথাই ছিলো না। কিন্তু ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করা বাঙ্গালীর ভাগ্যে ভগবানই লেখেননি! তুমি আমি কি করব? যা হবার নয়, তা জোর করে করা যায় না। নানা দল, নানা মত, নানা স্বার্থ এসে এখানে সংঘর্ষ বাধায়। এসব কাটিয়ে তবু যেখানে ঐক্য গড়ে উঠে, সেখানে ভগবানের আশীর্বাদ এসে পড়ে। আমাদের এই বিশ্বাস আছে।

তুমি তোমার কাজ কবে যাও। তারপর একদিন তোমার কাজে যদি সত্য প্রকাশ পায় তবে তাকেই কেন্দ্র ক'রে ঐক্যের শক্তি গড়ে উঠবে।

আমি ভাল। তোমার সর্বাঙ্গীণ কুশল কামনা করি।

আশীর্বাদক

শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য।

কিছু কথা

উত্তরবঙ্গ আমার জন্মভূমি নয়, কর্মভূমি। কর্মভূমি অনেক সময় বাসভূমি হয়ে উঠে না। কিন্তু, উত্তরবঙ্গ আমার বাসভূমিও। এই গ্রন্থে হয়তো তার প্রমাণ পাওয়া যেতে পারে।

উত্তরবঙ্গের পাঁচটি জেলায় তিরিশটির মতো শহর। আটান্নটি থানায় সাত হাজার সাতশ' বাষট্টিটি মৌজা। ২২,০২৫'০ বর্গ কি.মি. বিস্তীর্ণ উত্তর-বঙ্গের ভূখণ্ডে শহরগুলো গ্রাম-সমুদ্রের মাঝে যেন এককেটি ছোট ছোট দ্বীপ। প্রায় সব শহরের জন্ম গাঁয়ের গর্ভ থেকে। এদের চরিত্রে উত্তর-দক্ষিণে সামান্যই প্রভেদ। কিন্তু উত্তরের গ্রামগুলোর আকৃতি-সংস্কৃতিতে দক্ষিণের সঙ্গে কিছু কিছু সমতা থাকলেও চরিত্র-বৈচিত্র্যে অনেকখানিই ভিন্ন। আর উত্তর-দক্ষিণের সমতা ভিন্নতা নিয়েই বৈচিত্র্যে ভরা আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গ।

প্রায় সতেরো বছরের কর্মভূমি উত্তরবঙ্গে প্রায় চৌদ্দ বছর ধরে আমি বহু গ্রাম ঘুরেছি। এরমধ্যে পশ্চিম দিনাজপুর জেলার গ্রামগুলোয় সর্বাধিক। গ্রামগুলোকে আমি বাইরে থেকে দেখিনি, দেখেছি ভেতর থেকে। এখানে বলে রাখা দরকার, এই গ্রামে গ্রামে ঘোরাঘুরি আমার পেশাগত নয়, নেশাগত। এই নেশার জন্য আমি যাঁর কাছে সবিশেষ ঋণী, তিনি সমাজসেবী শ্রদ্ধেয় পবিত্র দে।

এই দীর্ঘ সময়ের ঘোরাঘুরির বিচিত্র অভিজ্ঞতা থেকে ছোট বড় কয়েকটি নিবন্ধ লিখেছিলাম সাময়িক পত্র-পত্রিকায়। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রদ্ধেয় ডঃ নির্মল দাশ এবং এশিয়াটিক সোসাইটির কর্মী প্রবীন গবেষক বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশিত নিবন্ধগুলোর একটি সংকলন প্রকাশ করার জন্য আমাকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করেন। বলাবাহুল্য, এই উৎসাহের ফলে ও বলে প্রকাশিত নিবন্ধগুলো থেকে বাছাই ক'রে এই সংকলনগ্রন্থ রচিত হয়েছে। এই গ্রন্থ উত্তরবঙ্গ লোকযান সংস্থা প্রকাশের প্রথম উদ্যোগ গ্রহণ করলেও অবশেষে শিলালিপি প্রকাশন সংস্থার অন্যতম স্বত্বাধিকারী বন্ধুবর অরুণকান্তি ঘোষের আগ্রহে তাঁর হাতে প্রকাশনার দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয়। উত্তরবঙ্গ লোকযান অবশ্য এই গ্রন্থের বেশ কিছু আগাম গ্রাহক তৈয়োরি ক'রে দিয়েছে। এতে বোধকরি, প্রকাশক উৎসাহিত ও খানিকটা নিশ্চিন্ত। উত্তরবঙ্গ লোকযান গ্রামোন্নয়নে নিবেদিত সংস্থা। তাই স্থির করেছি, এই গ্রন্থের প্রথম এক হাজার কপি বিক্রির রয়্যালটি সংস্থার তহবিলে দান করব।

শিল্পী বন্ধু প্রণবেশ মাইতি গ্রন্থটির প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণের দায়িত্ব সেচ্ছায় গ্রহণ করায় আমি বাধিত। তাছাড়া, ধনধান্যে ও ভূমিলক্ষ্মী (অধুনালুপ্ত) পত্রিকার সৌজন্যে যথাক্রমে, মুখোশ নাচ, খন লোকনাট্য, বিষহরা 'ব'-এর 'ভুরা' (নৌকো) ছবিগুলোর ব্লক পাওয়ায় আমি কৃতজ্ঞ। শান্তিকুমার মিত্র ও বীরেন সাহার কাছে এ জন্যে আমি ঋণী। যদিও উক্ত ছবিগুলো আমারই সংগ্রহ এবং আমার নিবন্ধের সঙ্গে পত্রিকা দুটিতে প্রকাশিত হয়েছিল।

গ্রামের যথার্থ চরিত্র তার সংস্কৃতির মধ্যে নিহিত। এই সংকলন উত্তরবঙ্গের গ্রাম সংস্কৃতির একটি পূর্ণাঙ্গ দলিল, এমন দাবী আমি করি না। তবে, গ্রন্থটিতে এ যাবৎ অনালোচিত বা স্বল্পালোচিত উত্তরবঙ্গ-গ্রাম-সংস্কৃতির বহু চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। আমার সংগ্রহে এবং প্রকাশিত নিবন্ধগুলোতে আরো বহু অজ্ঞাত বা স্বল্পজ্ঞাত বিষয় আছে যা উত্তর গ্রাম চরিত জানার পক্ষে বিশেষ সহায়ক। এই সংকলনের দ্বিতীয় খণ্ডে সেগুলো দেওয়ার ইচ্ছে আছে। অবশ্য, বর্তমান সংকলনটি যদি পাঠকের কাছে সমাদৃত হয়, তবেই সে ইচ্ছে বাস্তবতা পেতে পারে।

আমার সর্বাধিক ঘোরাঘুরি দেশী, পলি ও রাজবংশীদের গ্রামগুলোতে। দেশী-পলিরা প্রধানতঃ পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় বসবাস করেন। তাঁরা বৃহত্তর রাজবংশী এবং বোড়োজনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত বলে অনুমিত। দুর্ভাগ্যবশতঃ বঙ্গ সংস্কৃতিতে তাঁরা স্বল্পজ্ঞাত, স্বল্পালোচিত। আমার এই গ্রন্থে তাঁরাই সবচেয়ে বেশী প্রধান্য পেয়েছেন।

এই গ্রন্থটি দুটি বিভাগে বিন্যস্ত। বারোমাসিয়া ও পাশোসি।

বারোমাসিয়া বিভাগে সারা বছরের বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত কয়েকটি ব্রত, আচার, পুজো-পার্বণ এবং অন্ততঃ একটি মেলা যুক্ত। এগুলোর মধ্যে কাষ-ব এবং রাজা গণেশ' নিবন্ধটি গবেষণামূলকপত্র হিসাবে ১৯১৮ সালে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের আমন্ত্রণক্রমে পঠিত। এর ইংরাজী রচনাটি Post Plenary session, Folklore & Literary Anthropology of Xth international Anthropological and Ethnological Sceince Congress-এ কলিকাতায় ১৯১৮ সালে পঠিত। বাংলা ও ইংরেজি উভয় নিবন্ধ দুটি পরবর্তিকালে অমৃত পত্রিকা এবং ভারত প্রতিভায় প্রকাশিত।

'পাশোসি' বিভাগে বিবিধ বিষয় স্থান পেয়েছে। উভয় শব্দ দুটি 'দেশী-পলি-রাজবংশী'দের কথ্য ভাষা থেকে সংগৃহীত। পাশোসির অর্থ পাঁচ রকম শস্য।

যতদূর মনে আছে, আমার এই নিবন্ধগুলো আনন্দবাজার পত্রিকার রবিবাসরীয় আলোচনা, উত্তরবঙ্গ সংবাদ, ধনধান্যে, পশ্চিমবঙ্গ, নতুন ভারত, বারোমাস, অমৃত এবং অধুনালুপ্ত ভূমিলক্ষ্মী পত্রিকায় নানা সময়ে প্রকাশিত। সংকলনকালে এগুলোর কিছু অংশ বর্জিত আবার সংযোজিত।

গ্রামে ঘোরাঘুরি তথ্য সংগ্রহে আমি প্রেরণা উৎসাহ পেয়েছি অনেকের কাছেই। কিন্তু এ বিষয়ে আমার জীবনে অবিস্মরণীয় প্রয়াত আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। তাঁর স্বহস্তলিপি এই গ্রন্থের গৌরব, আমার গর্ব।

প্রসঙ্গত, মনে পড়ে, ডাঃ চারুচন্দ্র সান্যালের সদাহাস্য মুখখানি। তিনিও আজ প্রয়াত। আমাকে আচার্য সুনীতিকুমারের কাছে তিনিই পাঠিয়েছিলেন। রাজবংশী, মেচ, টোটোসহ উত্তরবঙ্গের বহু সম্প্রদায়ের কথা তুলে ধরে তিনি আমার মতো অনেক অন্বেষক, গবেষকের দিশারী।

আমার পরম শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের একখানি পত্রও আমার পরিচিতি সৃষ্টিতে সহায়ক। তাও আমার গর্ব, আমার সম্পদ। অনেকের পরামর্শে সে পত্রখানি এই গ্রন্থে যুক্ত করেছি।

এই গ্রন্থখানির নামকরণ আমার ক্ষমতার বাইরে ছিল। এর জন্যে আমি কৃতজ্ঞ শ্রদ্ধেয় প্রখ্যাত সাংবাদিক লেখক এবং সম্প্রতি পদ্মশ্রী অমিতাভ চৌধুরীর কাছে।

বিভিন্ন সময়ে আমার অনেক লেখা অনুলিপিতে সাহায্য করেছে প্রীতিভাজন ছাত্র অশোককুমার সেনগুপ্ত ও রথীন্দ্রনাথ রায়। এই সংকলন গ্রন্থ বিষয়ে তাঁদেরও যথেষ্ট আগ্রহ দেখেছি। এই প্রসঙ্গে আমি তাদের ধন্যবাদ ও স্নেহাশিস জানাই।

অধ্যাপক জ্যোৎস্নাকুমার সেন এবং ডাঃ বৃন্দাবনচন্দ্র বাগচী আমার প্রতিটি প্রকাশিত নিবন্ধ খুবই আগ্রহ সহকারে পড়ে মতামত দিয়েছেন। তাঁরা আমার অগ্রজ এবং গ্রাম সংস্কৃতি ব্যাপারে দরদী। এই গ্রন্থ বিষয়ে পরোক্ষ অবদান তাঁদেরও রয়েছে।

জানা প্রিন্টিং কনসার্ন-এর সহযোগিতা প্রসঙ্গত স্মরণীয়। মুদ্রণের ব্যাপারে এই প্রেসের সব কর্মী আমার সকল নির্দেশ মেনে নিয়েছেন। সকল চেষ্টা সত্ত্বেও অনবধানতা বশতঃ কিছু কিছু ত্রুটি থেকে গেছে, এর জন্য আমি দুঃখিত।

দেশী, পলি, মেচ, রাভা রাজবংশীদের পল্লীগুলো প্রধান সড়ক থেকে অনেক ভেতরে। বাইরে থেকে দেখা যায় না, বোঝা যায় না। এঁদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যও তাই। এঁদের প্রতিভা প্রাণশক্তি সহজ সরল উদার হৃদয়ের পরিচয় পেতে গেলে ভেতরে প্রবেশ করতে হয়। সে কাজ একজন বহিরাগতের পক্ষে দুরূহ। কত কত রাজশক্তি চলে গেছে উত্তরবঙ্গের উপর দিয়ে। কত জন সংস্কৃতি মুছে গেছে তাঁদের প্রতাপে, কিন্তু তা সত্ত্বেও সকল চক্ষুর আড়ালে দূরে থেকে এইসব জনগোষ্ঠী লালন করেছেন, প্রয়োজনে গ্রহণ বর্জনের মাধ্যমে সমন্বয় ঘটিয়েছেন তাঁদের সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতি দেখার, দেখাবার অধিকার যাঁরা দিয়েছেন তাঁদের সকলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

শিশির মজুমদার

সূচীপত্র

বারমাসিয়া

পাশোসি

বারোমাসিয়া

জল দেগে জলাইশোরী ।। যদি আষাঢ়-শ্রাবণে ইন্দ্রের করুণাধারা নেমে না আসে মাটির বুকে, ক্ষেতের ফসলে, তখন সারা উত্তরবঙ্গ জুড়ে রাতের আঁধার চিরে মেয়েরা গাইতে বেরোয় যে গান, পশ্চিম দিনাজপুরে 'দেশী' 'পলি' সমাজে তার নাম জলমাঙ্গা। জলপাইগুড়ি কোচবিহারে কোচ-রাজবংশী সমাজে তারই নাম হুদুমদেওর গান।

এই সময় পশ্চিম-দিনাজপুর জেলার দেশী পলি এমনকি মুসলমান মেয়েরাও করুণস্বরে গান গেয়ে জলের তথা বৃষ্টির প্রার্থনা করেন 'জল দে গে জলাইশোরী।'

এই গানই হল বর্ষার গান।

যুগ বদলের সঙ্গে সঙ্গে নিয়মকানুনও বদলে যায়। বলাবাহুল্য, জলমাঙ্গার গানের ক্ষেত্রেও এই বদল ঘটেছে অবশ্যম্ভাবীভাবে। তবে এখনো এ গানের অংশগ্রহণকারিণী একমাত্র মেয়েরা। পুরুষের শুধু অংশগ্রহণ নয়, দর্শনও নিষেধ। এই নিষেধ অমান্য করলে তার সাজা কঠোর। এটাই সমাজের বিধান।

খরায় খরায় গ্রাম যখন খাঁ খাঁ। আকাশে কালো মেঘের চিহ্নমাত্র নেই। তখনই গ্রামের মেয়েরা বিবাহিতা বা কুমারী জলমাঙ্গতে বেরোয়। তারা সঙ্গে নেবে একটি ঘট। ঘটে পাঁচটি সিঁদুরের ফোঁটা। ভেতরে একটি ব্যাঙের বাচ্চা। একটি পান। একটি সুপারী ও কিছু ফুল দূর্বা।

এই ঘট একটি সাত থেকে এগারো বছরের কোন বালিকা নেবে মাথায়। অবশ্য, এ বিষয়ে মতান্তর আছে। মেয়েটি বালিকাই যে হবে, তার কোন মানে নেই, সে ভরা-যুবতীও হতে পারে। যাইহোক, সেই বালিকা বা যুবতীর তখন নাম হবে 'ঘটধরি'। তাকে হতে হবে মায়ের একমাত্র মেয়ে। ঘটধরি কুইনার (কন্যার) ডান হাতে থাকবে পুরোনো একটি ছাতি (ইদানীং কাপড়ের ছাতি চালু)। এবং বাঁ হাতটি ঠিক যেন বরাভয় দেবার ভঙ্গিতে ওঠানো। সহচরী একজনের কাছে থাকবে একটি বড় ধামা। এই ধামায় মাগনের জিনিসপত্র রাখা হবে। পরিচালিকার কাছে থাকবে একটি পুঁটলি—সেখানে থাকবে সকলের বস্ত্র। এ থেকেই বোঝা যায় ব্রতচারিণীরা সবাই বিবস্ত্রা।

জল মাঙ্গবার সময় কোন গৃহস্থের উঠোনে প্রবেশকালে ঘটধরি বা মূল ব্রতচারিণী থাকবে সকলের ঠিক মাঝখানে। কোন গৃহস্থ পুরুষ এই সময় ঘরের বাইরে আসতে পারবে না।

ব্রতচারিণীরা গৃহস্থের অঙ্গনে গান গাইতে গাইতে প্রবেশ করবে—'জল দে গে জলাইশোরী' বলে। এই গান শুনে বাড়ির গিন্নী বা কন্যা হুলুধ্বনি দিয়ে ছুটে বেরিয়ে আসবে। ঘটি (লোটা) তে করে জল দেবে ঘটধরির মাথার ঘটে ও ছাতায়। তারপর সেই বাড়ির গিন্নী ধূপ দীপ জ্বালিয়ে তাদের আরতি করবে। ঘটধরি থেকে আরম্ভ করে সমস্ত ব্রতচারিণীর কপালে তেল-সিঁদুর প্রলিপ্ত করবে। এবং গলবস্ত্র হয়ে প্রণাম করে ঘট নামাতে বলবে।

ঘট নামানো হলে সেই উঠোনে চাষের অভিনয় করা হবে। অর্থাৎ একজন হবে হাল, দুজন বলদ, একজন চাষী। ঘড়া ঘড়া জল ঢালা হবে উঠোনে। নানা রঙ্গ-রসিকতাও এই সঙ্গে করা হবে। এবং সেইসঙ্গে জলের জন্য ইন্দ্র দেবতার কাছে প্রার্থনা জানাবে সকলে। কেননা, তাদের ধারণা ইন্দ্র দেবতা রুষ্ট, তাই আকাশে জলের দেখা নেই। তাঁকে তুষ্ট করতে হবে। তিনি তুষ্ট হলেই অঝোরে ঝরবে জলধারা।

নানা অঙ্গভঙ্গি সহকারে অভিনয়ের মধ্য দিয়ে ইন্দ্র দেবতাকে তুষ্ট করার চেষ্টা রয়েছে ব্রতচারিণীদের আচারে ও ক্রিয়ায়। তার উপরে আছে দলবেঁধে করুণ সুরের গান

আইস মেঘা বইস কাছে
খাও বাটাং পান

তোমার জইন্যে বাটাং পান
সাজাইয়ে রাখিছি
বরসিয়া খাও রে।

ব্রতচারিণীদের সঙ্গে গৃহস্থ মেয়েরাও সুর মেলায়

মেঘা মেঘা ডাক যে পাড়ি
মেঘা নাই মোর ঘরেরে
সকল মেঘা জড়ো হইছে
ফুলবাড়ি জঙ্গলে।

গানের পর গান ওঠে, সেই সঙ্গে নাচ।

মেঘে ওদে (বোদে) নাগায় ভাইরে
মেঘে অন্ধকার
মেঘের ভিতি দেখি ভাইরে
হালি ছাড়ে হাল
জমিতে পানি নাই বে
কিসে বহিম হাল
বাসুয়া বলদিয়া বইছে হাল
ও মোর গসাইরে, তাহনে দুব্বা নোতা ওঠে।
এক পাট মই দুই পাট মই
তাহনে দুব্বা নতা ওঠে।

খরার মাঠে কৃষক চেষ্টা করছে হাল দেবার। কিন্তু হাল চালানো যে কি কষ্টকর, তারই চিত্র ওই গান। মাঝে মাঝে রোদ ঢাকা পড়ে মেঘ দেখা দেয়, চাষী উৎফুল্ল হয়ে মাঠে নামে হাল বাইবার আকাঙ্ক্ষায়। কিন্তু, না, জল বিনা চাষ সত্যিই অসম্ভব। দুর্বা ঘাস উৎপাটন করা যায় না। এক্ষেত্রে, গোঁসাই—কৃষকের উপাস্য দেবতা। এরপরে সে কল্পনা করে

রূপারে হাল গোঁসাই
সোনারে ফাল
বাসুয়া বলদ দিয়ে
মুই জুড়ু হাল।

রুপোর হাল আর সোনার ফাল এবং সেই সঙ্গে বাসুয়া বলদ (সবচেয়ে বেশি

কর্মক্ষম, যার কাঁধে উঁচু কুঁজ থাকে অথচ ষণ্ড নয়) দিয়ে চাষ করা হবে।

ভবিষ্যতের সমৃদ্ধির কল্পনা রয়েছে এখানে

হামার নাদে পাটি পাবিচি
রোয়া সারি সারি
সেহ রোয়ার ধান মাবেচি
বাহান্ন পৌটি।

ব্রতচারিণীদের প্রার্থনায় আকাশে মেঘ জমল বৃষ্টি নামল। এ কল্পনা করে তারা গান গায়

পানি আইলো পানি আইলো
বায়ে বাতাস পানি আইলো
ভিঙজা গেল ভিঙজা গেল
গানড়ির ঢাবলা ভিঙজা গেলো
শুকাই গেলো শুকাই গেলো
গানড়ির ঢাবলা শুকাই গেলো
কেমনে শুকমে গানড়ির ঢাবলা
বায়ে বাতাসে শুকাই গেলো।

এইভাবে গান গাইতে গাইতে বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়ায় জলমাঙ্গার দল।

সংযোজনঃ জলমাঙ্গা বা জলের প্রার্থনা একটি আদিম যাদু বিশ্বাস। ভারতে তো বটেই পৃথিবীর সর্বত্র অদিজনবাসীদের মধ্যে আচার-কৃত্যে সামান্য ভিন্নতা নিয়ে একদা এটি প্রচলিত ছিল বিশেষভাবে। এখনো যে অপ্রচলিত তা নয়। সংবাদপত্রে কৌতুহলী পাঠক তা লক্ষ করতে পারেন। ৺চারুচন্দ্র সান্যাল, নির্মলেন্দু ভৌমিক, গিরিজাশংকর রায় তাঁদের উত্তরবঙ্গ বিষয়ক গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। ফ্রেজার সাহেবের গোল্ডেন বাও গ্রন্থে পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলের আচার-কৃত্য উল্লিখিত। রায়গঞ্জের ডাক্তার বৃন্দাবনচন্দ্র বাগচীর রঙপুর থাকাকালীন এবিষয়ে কিছু অভিজ্ঞতা রয়েছে, তা আমি শুনেছি। ব্যাক্তিগতভাবে আমি পশ্চিম দিনাজপুর, জলপাইগুড়ির অসংখ্য গাঁয়ে ঘুরে এ আচারটি সম্পর্কে নানা তথ্য ও গান সংগ্রহ করেছি। বীথি মজুমদার, নন্দিনী দত্ত এই সংগ্রহে আমাকে সাহায্য করেছেন। রায়গঞ্জ থানার চাপদুয়ার গাঁয়ের মালবিকা রায় জলমাঙ্গা আচারের মধ্যে যে

নাট্যরূপ রয়েছে তা জলপাইগুড়িতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার আয়োজিত লোক-উৎসবে দেখাবার ব্যবস্থা করেছেন। তাছাড়া হেমতাবাদ থানার রসোনপুর গ্রামের 'উত্তরবঙ্গ লোকযান' এর সদস্যারা এই আচারটির চমৎকার নৃত্যনাট্যরূপ কলকাতা সহ নানা স্থানে পরিবেশন করেছেন। শুনেছি, আরো কোন কোন গ্রামে এই দল আদিম যাদুবিশ্বাসযুক্ত আচারটির মধ্য থেকে লোককৃত্য নাট্যের চমৎকার ফর্ম আবিষ্কার করে মঞ্চস্থ করতে উদ্যোগী হয়েছেন। জলমাঙ্গা নাট্যটির শুরু এইরকম: ব্রতচারিণীরা ঘরের এবং কাজের পোশাক অর্থাৎ বুকানি পরে সারবদ্ধ হয়ে হাতে লণ্ঠন ঘট ছাতা ইত্যাদি নিয়ে নাচতে নাচতে মঞ্চে প্রবেশ করে। একটি কলাগাছ আগে থাকতেই মঞ্চে ছিল। সেই কলাগাছটিকে প্রদক্ষিণ ক'রে পূজোর জন্য সবাই হাঁটুমুড়ে বসে। পূজোর কাজ শেষ ক'রে তারা বাড়ি বাড়ি জলমাঙ্গতে বেরোয়।

জলমাঙ্গা এখন আর গোপন গুহ্য আচারমাত্র নয়। সভ্যতা সংস্কৃতির বিবর্তনে যে আদিম আচারটি লুপ্ত হয়ে যাচ্ছিল, তা ধীরে ধীরে নবরূপে তার সংস্কৃতির মহান ঐতিহ্যে বলীয়ান হয়ে উজ্জীবিত হচ্ছে। এখানেই তো লোক-সংস্কৃতির শক্তি, তার সার্থকতা।

বিষহরা ব এবং ব খেলার গান।। শ্রাবণ সংক্রান্তিতে উত্তরবঙ্গের 'দেশী-পলি' থেকে আরম্ভ করে সমস্ত রাজবংশী সমাজে বিষহরা ব্রত পালিত হয়। ভাদ্রের প্রথম দিনে বিষহরা দেবীর ভাসান।

পশ্চিম দিনাজপুর অঞ্চলে ব্রতকে 'ব' বলে। এ জেলায় দেখেছি বিষহরা-ব-এর সময় ছেলেরা রঙ মেখে মোখা পরে নানা অঙ্গভঙ্গী সহকারে একরকমের গান করে থাকে। তাকে বলে 'ব' খেলার গান।

'বিষহরা-ব' শ্রাবণ সংক্রান্তিতেই পালন করতে হবে, এমন কোন কথা নেই। শ্রাবণ সংক্রান্তির পর কৃষক তার অবসর মতো যে কোন সময় এই 'ব' পালন করতে পারেন। 'ব' খেলার গানের তেমন কোন নির্দিষ্ট সময়সূচি নেই। শ্রাবণ সংক্রান্তি থেকে শুরু করে অগ্রহায়ণ মাসে নবান্ন উৎসব পর্যন্ত 'ব' খেলার গান করা চলে। রাত জেগে ছোট ছোট পালার অভিনয় হয়। তারই একটির নাম 'হালুয়া-হালুয়ানী।'* অর্থাৎ কিষাণ-কিষাণীর সুখেদুখে ভরা দাম্পত্য জীবনের নক্সা।

'বিষহরা-ব'-এর আরেক নাম "ঝাড়া" বা 'মাজুষ ফুল-ব'। পঃ দিনাজপুর

* এই পালার কথা আমার প্রকাশিতব্য 'উত্তরবঙ্গের লোকনাট্য' গ্রন্থে বলা হয়েছে।

জেলার আমরাহার গ্রামে যে বিষহরা 'ব' হয়, তা খুবই বিখ্যাত। এই জেলার মালাকার সম্প্রদায় দৃষ্টিমুগ্ধকর অসংখ্য শোলার মাজুষ বা মঞ্জুষ ফুল এবং ভূরা বা নৌকো তৈয়ারি করেন। সেগুলো শ্রাবণ সংক্রান্তি আসবার আগে থেকেই হাটে হাটে বিকোয়। নৌকা এবং মঞ্জুষে প্রধানত মনসার রূপ আঁকা থাকে। লখীন্দর, চাঁদ সদাগর, বেহুলাও বাদ যায় না। এই ব পূজায় পঃ দিনাজপুরের দেশী সম্প্রদায় নিজেরাই পুরোহিত। পূজো শেষে ভাদ্র মাসের প্রথম তারিখে দুপুর বেলায় ঢোল, মেহুনা (সানাইয়ের মতো বাঁশি) বাজিয়ে বাড়ির কাছে পুকুরের মাঝখানে একটি বাঁশের মাথায় সেই মঞ্জুষ ফুল ঝোলান হয়। তারপর বাঁশটিকে সেখানে পুঁতে রাখা হয়। আর ভূরাও ভাসিয়ে দেওয়া হয় জলে। এর নামই ভাসান।

উত্তরবঙ্গে প্রচলিত কানী বিষহরার গান এই ব্রতের অঙ্গ নয়। ওই গান মানসিক না থাকলে করা হয় না। কিন্তু শ্রাবণ সংক্রান্তির দিন দুপুর থেকেই গ্রামের ছেলেরা হাতে লাঠি নিয়ে রঙ মেখে 'ব' খেলতে বেরোয়। আর গান করে। কিন্তু লক্ষণীয় এই যে 'ব' খেলার গানে বিষহরার কোন কথা নেই। সমাজের নানাবিধ অসঙ্গতি রঙ্গ-ব্যঙ্গে এই গানের মধ্য দিয়ে তুলে ধরা হয়। তাই, বোধকরি 'ব' খেলার গানের আরেক নাম রঙ-পাঁচালী। এই জেলায় যখনই কোন 'ব' বা ব্রত হয় (অবশ্যই বিষহরার পরে) তখনই ছেলেরা 'ব' খেলতে বেরোয়। 'ব' খেলতে খেলতে ছেলেরা গ্রামের গৃহস্থ চাষীর কাছ থেকে কিছু আদায়ও করে। যদি 'ব' খেলার দলকে গৃহস্থ কিছু না দেয়, তবে তাদের নিয়েও ছেলেরা (চ্যাংরা) গান বেঁধে ফেলে।

ব-এর অনুষ্ঠান মানেই হাউস বা আমোদের বিষয়। তাই, 'ব' হলেই এরা এই গানের মধ্য দিয়ে হাউস বা আমোদ করে থাকে। এই গানের সঙ্গে আজকাল হারমোনিয়াম চালু হয়েছে। তাছাড়া ঢোল মেহনা, মঞ্জুরা বা মন্দিরা তো আছেই।

এই প্রসঙ্গে একটি 'ব' খেলার গানের নমুনা দেওয়া যেতে পারে।

> হলোলোই বাফ্, হলোলোই বাফ্
> তোর বাফ্ নিন্দ গেল
> তোহ নিন্দ যায়রে
> হলোলোই বাফ্।

হায়শিয়াল ঘরা ভাত চড়াইছুং
চুইয়ে উঠে ধুয়া।
কানাটাটিদি ঢ়ুমকাই দেখুঁ
ওহ্ যে বান্দর মুহা।
কতুভূআউ আলাঝালা
চালৎ থুইস্তম্ দাও।
কানাটাটিদি জল ফেলানু
বন্ধুয়ার ভিজিল্ গাও।
বালিয়া নদীর পূব পাকে মোর
বন্ধুয়ার ছে ঘর।
দুইটা পাইসা চালে বন্ধুর
গায় আসে জ্বর।
তেল নাই যে কুলো নাই
গতর স্তমস্তম করে।
মশার কামড়ে ছেলাক নিন্দ
নাই ধরে (রে)।
দ্বারকের আগা বকা কুইটা
ঝুরিয়া নামে বন
পিরিত করিয়া ছাড়িয়া পালাল
গড়গড়াছে মন।*

[**শব্দার্থঃ** বাফ—বাপ। নিন্দ—নিদ্রা। হায়শিয়াল—হেঁশেল। ঘরা—ঘর চুইয়ে—উননে। কানাটাটিদি—ভাঙ্গা বেড়ার মধ্য দিয়ে। ঢ়ুমকাই—উকি মারা। মুহা—মুখ। কতুভূআউ—লাউ মাটিতে রেখে। থুইস্তম—রেখেছি। দ্বারকের—দুয়ারের।]

---

*পশ্চিম দিনাজপুর জেলার কুশমণ্ডী থানার দিনোর সাপাড়া গ্রাম থেকে গানটি সংগৃহীত।
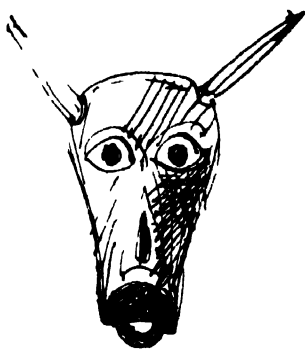
দশছিটা বা গহলক্ষ্মীর ডাক ॥ প্রতি বছরই ঘুরে ঘুরে আসে আশ্বিন সংক্রান্তি — শরৎকালের শেষ হেমন্তের শুরু। হেউঁতি (আমন) ধানে ভরা ক্ষেত। আর কদিন পরেই ধান কাটা হবে শুরু। কৃষকের কাছে ধানই সব সেরা যার আরেক নাম লক্ষ্মী। তিনিই ভূমিলক্ষ্মী আর উত্তরবঙ্গের ভাষায় গহলক্ষ্মী (গৃহলক্ষ্মী) বা ক্ষেতিলক্ষ্মী। অথবা পশ্চিম দিনাজপুরে 'গাড়িগুড়িয়া-র।'

সারা উত্তরবঙ্গে রাজবংশী বা 'দেশী পলি' সম্প্রদায়ের কাছে এই দিনেই গৃহলক্ষ্মী পুজো। সংক্রান্তির দিনটির আরেক নাম 'দেমাসিয়া'। ক্ষেতিলক্ষ্মী পূজোই আদি লক্ষ্মী পূজো। জমির মালিক এই ভার বহন করেন। জমির মালিকের নির্দেশে ভূমিহীন 'জনচাকর'-এর মাধ্যমে এই পূজোর কাজকর্ম সমাধা হয়।

কেউ কেউ এই পূজোয় মণ্ডপ ঘর তৈরি করেন। প্রয়োজন মতো বাড়ির বাইরের দিকে উঠোনে পাটকাঠি বা খড় দিয়ে তিন দিক ঘেরা হয়। শুধুমাত্র পশ্চিমদিক খোলা থাকে। মণ্ডপ ঘরের ভেতরে মাটি দিয়ে উঁচু করে ক্ষেতি-লক্ষ্মীর থান তৈরী হয়। সেখানে একজন পূজাকর্মী ধানের ক্ষেত থেকে গোড়ার মাটিসমেত একথোপ ধান গাছ থানের ভেতর এনে রাখেন। যথা সময়ে সেই থোপের গোড়ায় কলাপাতা দিয়ে মুড়ে বেঁধে থানে (বেদি)

বসানো হয়। ধানের থোপটি ক্ষেত থেকে এমনভাবে তুলতে হবে, যেন তার ধান ফুল থাকে আর তার সংখ্যাও হবে বেজোড়।

ক্ষেতিলক্ষ্মীর পূজোর নৈবেদ্য হবে চাল, চিড়া, দুধ, দই, জামুরী, লেবু, কলা প্রভৃতি। সাধারণভাবে এই পূজোয় বলিদানের প্রথা নেই। তবে পঃ দিনাজপুর জেলার প্রায় সমস্ত পূজা বা ব্রত-অনুষ্ঠানে বলিদানের প্রথা লক্ষ করা গেছে। হাঁস ও কবুতর বলিদানই বেশি প্রচলিত। যেসব পাখি বা জন্তু কৃষির ক্ষতি করে পূজো উপলক্ষে তাদের বলি দেওয়া হয়ে থাকে। বলি না দিলে দেব বা দেবী অসন্তুষ্ট হবেন—এই বিশ্বাসের বলে বলিদানের মাধ্যমে ওই সব জীবসংখ্যা কমিয়ে দেবার চেষ্টা করা হয়। অথবা এসব আচারের পেছনে অন্য তত্ত্ব খোঁজা যেতে পারে। আপাততঃ তা নিষ্প্রয়োজন।

এই সব পূজোয় পুরোহিত নিজ সম্প্রদায়ের অধিকারী বা মালাকার। কখনো কখনো জমির মালিক নিজেই পূজোর কাজ শেষ করেন—দেশীয় ভাষায় মন্ত্র পড়েন। কখনো কখনো নিজ সম্প্রদায়ের কোন বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিকেও এই দায়িত্ব দেওয়া হয়ে থাকে। লক্ষ্মীদেবী এই পূজোয় খুশি হয়ে যে আশীর্বাণী পাঠান তা হল :

শীষোতে বিশ হোক
রামলক্ষ্মণ গালা হোক।

অর্থাৎ একটি ধানের শীষ থেকে যেন বিশ ফলন হয় এবং ধানগাছগুলো যেন বড় হয় রামলক্ষ্মণের গলা পর্যন্ত।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা দরকার সমস্ত রাজবংশী দেশীপলি সমাজের কাছে সীতাদেবীই লক্ষ্মী।

এই পূজোর সময় কোথাও কোথাও শূকর বলির প্রথা আছে। আর পঃ দিনাজপুর জেলায় তো হাঁসের মাথা ছিঁড়ে ধানের ক্ষেতে পুঁতে রাখাটাই আবশ্যিক রীতির মধ্যে গণ্য। হাঁস এবং শূকর দুই ধান ক্ষেতের অনিষ্ট সাধন করে।

এই সময়কার একটি অনুষ্ঠানের নাম দলছিটা। তাই, এই দিনটিকে অনেকে দলছিটা বলেও অভিহিত করেন। দলছিটা অনুষ্ঠানে প্রথমে কাঁঠালপাতা দিয়ে ছোট ছোট দীপ তৈয়ারি করা হয়। যার নাম সরুই। গইতা বা গাওয়া ঘি সেই সরুইতে মাখিয়ে রাখতে হয়।

তারপর সলতে দিয়ে ঘিয়ের বাতি জ্বালাতে হয়। সেই সঙ্গে কলা, চিনি,. আটা এবং জামুরি (বাতাবি)। লেবুর পাতা বড় কড়াইতে ভেজে ছাম গাইন বা উদুখল দিয়ে গুঁড়ো করে তার সঙ্গে একটা হাঁসের ডিম ফাটিয়ে একত্রে মিশ্রিত করে যে বস্তুটি তৈরি হয় তার নাম 'দল'। সেই দলগুলি কাঁঠাল পাতার ছোট ছোট পাত্রে বা বাটিতে থাকে। তারপর সমস্ত ভক্ত মেয়ে-পুরুষ সেই দলপাত্রগুলি নিয়ে সারিবদ্ধ হয়ে ধানের ক্ষেতে প্রবেশ করে। আর সরুইগুলি নিয়ে প্রবেশ করে একদল। তারা ধানের সমস্ত ক্ষেতে ছড়িয়ে পড়ে। ঘুরে বেড়ায় ক্ষেতের এদিকে সেদিকে। আর পাত্রস্থিত দল ছিটিয়ে দেয় ধানের ক্ষেতে। সমস্বরে বলে একটি ছড়া বা মন্ত্র

সরুই সরুই সরুই
ইন্দুর ধরিয়া পকামাকড় দূরৎ পলা
মানসী ঘরৎ সন্ধা খেল খেলা
হাঁসের ডিমা কচুর ফুতি
আয় নক্ষী আমার ভিতি
মানুষের ধান আউল বাউল
মোর ধান ধরমের চাউল।*

সমস্ত দলগুলি ছেটানোর পর হাঁসের মাথা ছিড়ে তার রক্ত ছিটিয়ে দেওয়া হয় ধানের গোলায়। আর হাঁসের মাথাটি ধানক্ষেতের মধ্যে পুঁতে রাখা হয়।

সকালে যেখান থেকে ধানের থোপ সংগ্রহ করা হয়েছিল, সেখানে সেই থোপ নিয়ে এসে আবার রাখা হয়। তারপর দুটি পাটকাঠিতে সিন্দুর লেপনের কাজ। কাঁঠাল কাঠির উপর নরম মাটি বসিয়ে পাতার সরুইও মাটি-সিন্দুরে প্রলিপ্ত করা হবে। তাকে বলা হয় সিন্দুর চুমা। এই উপলক্ষে গৃহপালিত সমস্ত জীব-জন্তুকে বিশেষকরে গরুগুলিকে সিন্দুর চুমানো হয়ে থাকে। তারপর সরুইসহ পাটকাঠিদুটি ক্ষেতের আলের মাঝখানে পুঁতে দেয়া হয়। জ্বালান হয় ধুপ ও দীপ।

---

* (ছড়াটি সংগ্রহ-মাধ্যম : রবীন্দ্রনাথ সরকার, দিনোর সাপাড়া এবং হরেন দেবশর্মা গ্রাম : টুঙ্গিল। পঃ দিনাজপুর)

পঃ দিনাজপুর জেলায় এই দিনের ব্রতানুষ্ঠানকে গাড়ি-গুড়িয়া বলে। ১লা কার্তিক হয় তার ভাসান।

যে সব বস্তু দিয়ে দল তৈরি হয়, নিশ্চয়ই তার রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া আছে যা ধানের পোকার প্রতিষেধক এবং ধান বাড়তে সহায়তা করে। হাঁস ধান খায় ধানের ক্ষেতের আল নষ্ট করে। শূকর প্রসঙ্গে একই কথা প্রযোজ্য। তাই তাদের বলি দেওয়া হয়। হাঁসের মাথা পোঁতা হয় ধানের ক্ষেতে। আর রক্ত ছেটানো হয় ধানের গোলায়।

সংযোজনঃ এই অঞ্চলে লক্ষ্মীর বন্দনা তিন শ্রেণীর। আশ্বিন সংক্রান্তির ক্ষেতিলক্ষ্মী পুজো, কোজাগরী লক্ষ্মী পূর্ণিমার খজাগর এবং মানসিক অনুযায়ী বছরের যেকোন সময়ে অনুষ্ঠেয় লক্ষ্মী ব। লক্ষ্মী ব উপলক্ষে যে গান হয় তার নাম লক্ষ্মীয়ালা। সীতাই হলো লক্ষ্মী। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য লক্ষ্মী বিষয়ক যে গান বাঁধা হয় তার ভিত্তি রামায়ণ। কোচবিহারে তার নাম 'কুশান'। পশ্চিম দিনাজপুরে লক্ষ্মীয়ালা গান দু'রকমের। এক, ·াব্রুয়ালী। দুই কল্মী। চামর হাতে মূল গায়েন। মন্দিরা হাতে দুই দোহার। এছাড়া একজন বাজাবে খোল আর দু'জন ছোকরা (নারীবেশে তরুণ ইদানীং নর্তকী) নাচবে। তারাই প্রয়োজনে লবকুশের চরিত্রে অভিনয় করবে। এই হলে বারুয়ালী বে কল্মী। কুশান গানে সীতা; রাম লব-কুশ হনুমান প্রভৃতি বিভিন্ন চরিত্রের সাজসজ্জা সহকারে অভিনয় হয়। তিন থেকে সাত রাত্রি চলে এর গান। বস্তুত, লবকুশের কীর্তিগাথা সেখানে প্রধান।

এই রচনাটি লেখার ক্ষেত্রে ডঃ গিরিজাশঙ্কর রায়-এর গবেষণা গ্রন্থ "রাজবংশী সমাজের দেব-দেবী ও পূজা-পার্বণ" আমায় সহায়তা করেছে।
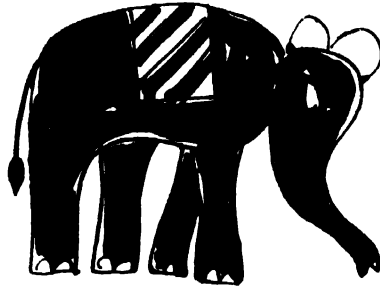
দুর্গাপূজা ॥ খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম শতকের আগে উত্তরবঙ্গে আর্য সংস্কৃতি প্রবেশাধিকার লাভ করেনি। ওই সময়ের আগে থেকে এই অঞ্চলে, বলতে গেলে গোটা উত্তর-পূর্ব ভারতে এমন এক শক্তিশালী জনগোষ্ঠী বসবাস করতেন যাঁরা নৃতাত্ত্বিক বিচারে ইন্দোমোঙ্গলীয় এবং ভাষাগতভাবে অষ্ট্রিক, দ্রাবিড় ও তিব্বত-ব্রহ্মীগোষ্ঠীর মিশ্রণ১ সম্ভূত। বলাবাহুল্য, উত্তর বাংলার রাজবংশীগণ তাঁদের শাখাবিশেষ। তাই স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন জাগে, কবে থেকে তাঁরা দুর্গাপূজা শুরু করেছিলেন ?

এ অঞ্চলে আর্যসংস্কৃতি একটু দেরীতে প্রবেশ করায় এবং নানা কারণে আশানুরূপ লালিত না হওয়ায় এখানকার সংস্কৃতিতে প্রাগার্য সভ্যতা-সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যগুলি একটু বিশেষভাবে এখনো প্রতীয়মান। তবে, দুর্গোৎসবের ক্ষেত্রেও কি তা প্রত্যক্ষ ?—এই কৌতুহল জাগ্রত হয়।

দুর্গোৎসব ব্রাহ্মণ্যসংস্কৃতির একটি অঙ্গ। আজ তা শুধু হিন্দু নয়, গোটা বাঙ্গালী সংস্কৃতির একটি শ্রেষ্ঠতম প্রকাশ। কিন্তু উত্তরবাংলার ক্ষেত্রে এর রূপ কি—তার আলোচনা এ-যাবৎ সামান্যই হয়েছে। উত্তরবাংলার সঙ্গে রাজবংশী গোষ্ঠীর সংস্কৃতি অবিচ্ছেদ্য এবং গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্কে অন্বিত। সেদিক থেকে বলতে গেলে ব্রাহ্মণ্যসংস্কৃতি প্রভাবিত দুর্গোৎসব উত্তরবাংলায় সুপ্রাচীনকালের ব্যাপার নয়। বর্তমান উত্তরবাংলার পূজা, পার্বণ ও মেলার ইতিহাস নিলে দেখা যায় যে দুর্গাপূজো এখানে ক্রমশ বিস্তৃত হচ্ছে ও একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে নিচ্ছে। দক্ষিণে মালদহ থেকে উত্তরপূর্বে কোচবিহার পর্যন্ত দুর্গাপূজা উপলক্ষে অন্তত সত্তরটি মেলা বসে। এর মধ্যে প্রায় ২৫টি মেলার বয়স অন্তত একশ

বছরের উপর। দুর্গাপূজা উপলক্ষে মালদহ কোচবিহার ও জলপাইগুড়িতে কয়েকটি 'বাইচখেলা'ও হয়। এক্ষেত্রে মালদহের ইংরেজবাজার থানার আড়াপুর, কোতোয়ালি, কালিয়াচক থানার চরি অনন্তপুরের বাইচখেলা ও মেলা সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। তবে একথা স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, দক্ষিণ কিংবা পূর্ববঙ্গে বাঙ্গালী সমাজে যেভাবে দুর্গাপূজা গৃহীত, উত্তরবঙ্গে স্বভাবতই সে-ভাবে অন্তত সুপ্রাচীন কাল থেকে গৃহীত নয়। তার প্রধান কারণ একটি শক্তিশালী প্রাগার্য জনজাতি এ অঞ্চলে তার প্রাচীন সভ্যতা-সংস্কৃতি দীর্ঘকাল ধরে সুরক্ষিত রেখেছে।

উত্তরবঙ্গে কোচবিহার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা বিশ্বসিংহই সর্বপ্রথম ব্রাহ্মণ্যসংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক। তাঁর পুত্র মহারাজা নর নারায়ণের সময়কাল (১৫৩৩ অথবা ১৫৪০ খৃঃ) থেকে ক্ষত্রিয় রাজবংশী অধ্যুষিত উত্তরবঙ্গে দুর্গাপূজা প্রচলিত হত বলে কেউ কেউ মনে করেন। এই প্রসঙ্গে একটি গল্প আছে। তা হল এই: মহারাজা নরনারায়ণের ভাই শুক্লধ্বজ সিংহাসন লাভের ইচ্ছায় একদা রাজসভার মধ্যে প্রবেশ করে নরনারায়ণকে হত্যা করতে উদ্যত হন। সে সময় স্বয়ং ভগবতী আবির্ভূত হয়ে দশবাহুদ্বারা মহারাজকে বেষ্টন করে দাঁড়ান। এই দৃশ্য দেখে শুক্লধ্বজ চমকিত ও অভিভূত। অবশেষে তিনি ভাইয়ের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে পালিয়ে যান। কিন্তু এই ঘটনা মহারাজা নরনারায়ণের মধ্যে সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। তিনি ভাবেন, শুক্লধ্বজ চক্রান্তকারী হলেও তাঁর তুলনায় অধিকতর ভাগ্যবান। তাই সে ভগবতীর দেখা পেয়েছে। এই ভাবনায় বিভোর হয়ে নরনারায়ণ অন্নজল ছেড়ে নির্জনে বাস করতে থাকেন। এইভাবে দুই রাত্রি কেটে গেলে তৃতীয় রাত্রিতে মহারাজা স্বপ্নে দেবীর দর্শন পান। স্বপ্নদৃষ্ট দেবীর মূর্তি গড়িয়ে তিনি রাজবাড়িতে পুজো প্রচলন করেন। সেই মূর্তি আজও সেখানে পুজো পেয়ে আসছে। তবে, সে মূর্তির সঙ্গে লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ নেই। তার বদলে তাঁর দুই পাশে রয়েছেন জয়া আর বিজয়া। এই দেবীর দুই চোখ জগন্নাথদেবের চোখের মতো কিঞ্চিৎ গোলাকার ও জলজলে। তাঁর বাহন সিংহের গায়ের রঙ ধবধবে সাদা।

অনেকের মতে, দুর্গা এখানে ভবানীমূর্তি রূপে পূজিতা। আগে 'ভবানী পূজা' নামে প্রচালিত ছিল। কোচবিহারে মদনমোহন বাড়িতে দুর্গাপূজার সময় প্রচলিত দুর্গা প্রতিমার (অর্থাৎ লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক গণেশ সহ)

পৃথকভাবে পূজো হয়। মদনমোহন বাড়িতে মহারাজার দেবীবাড়ির অনুরূপ ভবানী মূর্তিও আছে এবং তিনি এই সময়ে পৃথকভাবে পূজিতা। দেবীবাড়ির মতো একটি ছোট ভবানী মূর্তি এখানে দেখা যায়। এই ভবানী মূর্তি সম্পর্কে একটি কিংবদন্তী আছে। তাহ'ল এই রকম: কোচবিহার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা বিশ্বসিংহ ভুঁইয়াদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্তথাকাকালীন একবার অরণ্যের মধ্যে একটি দশভুজা দেবী প্রতিমা লাভ করেন। কারো কারো মতে, এই ভবানী মূর্তিটি বিশ্বসিংহ প্রাপ্ত দেবী প্রতিমা।

প্রাচীনকালে এই দেবীব পূজোয় নরবলিব প্রথা ছিল বলে কথিত। সে প্রথা উঠে গিয়ে নররক্ত দেওয়ার প্রথা চালু হয়। যাঁরা বংশানুক্রমে নররক্ত দেন তাঁরা মহারাজাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত সম্পত্তি ভোগ করেন। কোচবিহারেব পঞ্চানন বকসী এরকম একজন।

দেবীবাড়ির পূজা অনুষ্ঠানের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ অস্ত্রাগার পূজো। এই উপলক্ষে বাজারা নাকি খঞ্জন পাখি ওড়াতেন। যে দিকে পাখি উড়ে যেত সেদিকে রাজারা যুদ্ধযাত্রা স্থির করতেন। বিসর্জন পূজো শেষে স্থানীয় ডোমেরা তাদের নিজস্ব পদ্ধতিতে দেবী পূজো করে এবং শূকর বলি দেয়।২

অন্য একটি সূত্রে জানা যায় "কোচবিহারে দুর্গাপূজাব জন্য শহব এলাকায় বিরাট পাকা দুর্গামণ্ডপ আছে। মণ্ডপটি কোচবিহার রাজবাড়ির সম্মুখস্থ দেবী-বাড়ি রোডের উপর অবস্থিত। এই অঞ্চলে মণ্ডপটি 'দেবীবাড়ি' নামে খ্যাত। শারদীয়া উৎসব উপলক্ষে এই মণ্ডপেই দশভূজা দুর্গার মৃন্ময় মূর্তি নির্মাণ করিয়া ষষ্ঠী হইতে দশমী তিথি পর্যন্ত পাঁচদিনব্যাপী যথারীতি পূজা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। কোচবিহারবাসীগণের দাবী—এইরূপ বিরাটাকায় দুর্গামূর্তি বঙ্গদেশের অন্য কোন স্থানে নাই। এই পূজার প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, অষ্টমী তিথিতে দেবীর নিকট একটি মহিষ এবং রাজসরকারকৃত বরাদ্দ মোট সাঁইত্রিশটি পশু-পক্ষীর বলিদান। অষ্টমী তিথির রাতে দেবীর বিসর্জনকালে ঘাটে পূর্ব প্রথানুযায়ী দুটি শূকর বলি দেওয়ার প্রথাও প্রচলিত। তাছাড়া, অসংখ্য মানতকারী অষ্টমী তিথিতে দেবীর কাছে পাঁঠা, কবুতর ও হাঁস বলি দেন।"৩

কোচবিহারের মাষপালা গ্রামে যে দুর্গাপুজো প্রচলিত তা সবচেয়ে প্রাচীন বলে গ্রামবাসীরা দাবী করেন। মহারাজা নরনারায়ণ স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে এই পুজোর প্রচলন করেন বলে তাঁদের বিশ্বাস।৪

বস্তুতপক্ষে, উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজে দুর্গার প্রধান পরিচয় দেবী ঠাকুরাণী হিসাবে এবং শারদীয় দুর্গোৎসবের নাম 'যাত্রাপূজা' বা 'দেবীপূজা'। শারদীয় নবমী, কোথাও কোথাও দশমীর দিনটিকে 'যাত্রা' বলা হয়ে থাকে। এই দিনে রাজবংশী কৃষকেরা হৈমন্তিক ফসল উৎপাদনের জন্য ক্ষেত্র কর্ষণ শুরু করেন।৫ হৈঁউতি ফসল বা আমন ধানের প্রতি বাঙ্গালী সমাজের সবিশেষ আগ্রহ। পূর্ববঙ্গের বহু জেলায় বিজয়া দশমীতে ক্ষেতে হলকর্ষণের শুভারম্ভ দিন হিসাবে পরিগণিত। সুতরাং যাত্রাপূজা একটি কৃষিকৃত্য বিশেষ। কিন্তু দুর্গাপূজার উৎসব-অনুষ্ঠান গ্রামীণ জনসাধারণের কৃষিকৃত্যটিকে সম্ভবত গ্রাস করে ফেলেছে। উত্তরবাংলার ক্ষত্রিয় রাজবংশী সমাজে এই দিন প্রতি বাড়িতে মেয়েরা ঘরদোর পরিষ্কার ও লেপামোছা করে। তারপর সমস্ত প্রাঙ্গণে গোবর জল ছিটিয়ে দেয়। সেদিন ঘরের যাবতীয় সামগ্রী আঙ্গিনায় নিয়ে এসে রৌদ্রতপ্ত করে এবং প্রতিটি ঘরের দরজায় খড়িমাটি ও সিঁদুরের ফোঁটা দেওয়া হয়ে থাকে।

দুপুরে হয় সরস্বতী পূজো। বিদ্যার্থীরা নিজে কিংবা তাদের মা-বাবা বা অধিকারীর (নিজস্ব পুরোহিত) সাহায্যে নৈবেদ্য দান করে পূজো দেয়।৬

দুর্গাপূজো সাধারণের আয়ত্তের বাইরে। সমস্ত বঙ্গের পক্ষেই একথা প্রযোজ্য। বস্তুত এই পূজো রাজা, জমিদার বা বিত্তবান মানুষের মধ্যে একদা সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু পূজোর আনন্দ সার্বজনীন। বারোয়ারী পূজোর প্লাবনে আজ এই পূজো শুধুমাত্র বিত্তবানগোষ্ঠির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। কিন্তু উত্তরবঙ্গে বিত্তবান রাজবংশীরা শারদীয় দুর্গোৎসবের তুলনায় চৈত্রমাসে বাসন্তী পূজো অনেক বেশি করতেন এবং এখনো করে থাকেন। শারদীয় ও বসন্তকালের পূজোগুলোতে প্রধানত কামরূপী ব্রাহ্মণেরাই অংশ গ্রহণ করেন। কিন্তু বর্তমানে প্রায় অঞ্চলে বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণেরা ওই স্থান নিয়েছেন। ডঃ গিরিজাশঙ্কর রায় জনিয়েছেন, 'এখনকার দিনে অন্যান্য বাঙ্গালী সম্প্রদায়ের ন্যায় রাজবংশীরাও সার্বজনীন প্রথায় ব্যাপকভাবে দূর্গাপূজা করিতে আরম্ভ করিয়াছে।' ৭

কোচবিহার রাজার শাখাবংশগুলোতে যথানিয়মে এই দুর্গোৎসব হয়। এই শাখারই একটি জলপাইগুড়ি রায়কত বংশেও অনুরূপভাবে দুর্গাপূজো হত। কিন্তু বর্তমানে তা বদলে গেছে। ডঃ চারুচন্দ্র সান্যাল এই প্রসঙ্গে বলেছেন,

'রাজবাড়ির দুর্গা প্রতিমা ছিল বিরাট আকারের। তাঁর ঘোর লাল রং পায়ের উপর দাঁড়িয়ে একটিমাত্র মূর্তি। প্রায় ষাট বছর আগে লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক ও গণেশ বাহনসহ জুটে গেলেন এই মূর্তির পাশে। দুর্গার রঙও একটু ফিকে হয়ে এল। বাঘটি ধীরে ধীরে হয়ে গেল সিংহ। মনে হয়, দক্ষিণাগতদের সাথে কৃষ্টি সমন্বয়ে এই পরিবর্তন হয়েছে।'৮

পশ্চিম দিনাজপুর জেলার বাঘনগ্রাম নিবাসী সর্বোদয়-ব্রতী শ্রীপবিত্র দে মাত্র পঁচিশ বছর আগেও এই জেলায় দেশী-পলিদের দুর্গার রূপ দেখেছিলেন ব্যাঘ্র-বাহনা ঘোররক্তবর্ণা দ্বিভূজা এবং তাঁব পূজা 'দেবীপূজা' নামে অভিহিত ছিল।

এই দ্বিভূজা, কোথাও কোথাও চতুর্ভুজা দেবীই বস্তুত উত্তরবাংলার আদি দুর্গা। তাঁর নাম কোথাও ভাণ্ডানী আবার কোথাও ভাণ্ডারনী বা ভাণ্ডালী। এই দেবী সম্পর্কে অন্তত কয়েকটি জনশ্রুতির উল্লেখ করা যায়:

এক॥ "একদা নহুস নামে জনৈক রাজা রাজপ্রাসাদে শারদীয়া দুর্গাপূজার আয়োজন সম্পন্ন করিযা শিকাবে বাহির হন এবং তথায় শিকারের আনন্দে দুর্গাপূজার কথা বিস্মৃত হন। এদিকে রাজবাড়িতে যথারীতি পূজার পর বিজয়া দশমী তিথিতে দেবীর মূর্তি বিসর্জন দেওযা হয়; কিন্তু রাজার পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ না কবিযা মর্ত ত্যাগ করিতে ইচ্ছা না থাকায় দেবী চতুর্ভুজারূপে ব্যাঘ্রপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া বনমধ্যে উক্ত রাজার সম্মুখে উপস্থিত হন এবং রাজার পুষ্পাঞ্জলি যাচঞা করেন। সেদিন একাদশী তিথি, রাজা বনোমধ্যে বনফুল দ্বারা দেবীর পদে পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করেন। এই পূজা ভাণ্ডানী পূজা বলিয়া খ্যাত হয়।"

দুই॥ "কুচবিহারের মহারাজার পূজার পর দুর্গাদেবী কৈলাশ যাত্রা করেন। পথে নিজতরফ-৭৫ তালুকে ২নং সাঁটে দুর্গাদেবীর মালপত্রের তত্ত্বাবধায়ক অর্থাৎ ভাণ্ডারণী হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়ায় দুর্গাদেবীকে তিনদিন ওই স্থানে অবস্থান করিতে হয়। এই সময় স্থানীয় গ্রামবাসীর প্রতি স্বপ্নাদেশ হওয়ায় তিন-দিনব্যাপী পুনরায় দুর্গাপূজা হয়। দেবী ভাণ্ডারণীকে উপলক্ষ করিয়া ঘটনাটি ঘটে বলিয়া দেবী দুর্গা ভাণ্ডারণী নামে খ্যাত।"১০

তিন॥ "শারদীয় পূজা শেষে দশমী তিথিতে দেবী দুর্গার মর্তত্যাগ কালে তাঁহার ভগ্নী ভাণ্ডানীদেবী মর্তে তাঁহার পূজা প্রার্থনা করেন এবং দুর্গাদেবীর নির্দেশে শারদীয়া একাদশী তিথি হইতে তিনদিনব্যাপী শারদীয়া উৎসবের

ন্যায়ই ভাণ্ডালী পূজার প্রচলন হয়।"১১

চার ॥ "অসুরের অত্যাচারে প্রপীড়িত জনগণ দেবীকে আহ্বান করেন। দেবী সুন্দরী কন্যারূপে উপস্থিত হয়ে অসুর বিনাশ করে জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চলের মধ্য দিয়ে কৈলাশে যাবার পথে ভক্তবৃন্দের দ্বারা পূজিত হন। কোচবিহারের মেখলিগঞ্জে নাকি দেবীর এই পূজা সর্বপ্রথম প্রচলিত।"১২

ভাণ্ডানীদেবী নামে ভাণ্ডানী গ্রাম জলপাইগুড়ি ডুয়ারস্ এলাকায় অবস্থিত। ডঃ চারুচন্দ্র সান্যাল জানিয়েছেন, এই পূজা পশ্চিমে তিস্তা থেকে রায়ডাক নদীর তীর পর্যন্ত বিস্তৃত।১৩ জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়ি, ফালাকাটা, আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহার জেলার মেখলিগঞ্জ ও মাথাভাঙ্গা থানার গ্রামাঞ্চলে এই দেবীর পূজার প্রচলন সর্বাধিকভাবে পরিলক্ষিত। এই অঞ্চলগুলোতে কোথাও শারদীয় দুর্গাপূজার বিজয়াদশমীর পরবর্তী তিনদিনের মধ্যে এবং কোথাও লক্ষ্মী পূর্ণিমার সময়ে ভাণ্ডাবনী ঠাকুরানীর পূজো হয় এবং তদুপলক্ষে মেলা বসে। লক্ষণীয়, ভাণ্ডানী ঠাকুরানীর পূজারী সর্বত্রই রাজবংশী অধিকারী। সম্প্রতি অসমীয়া ও অন্যান্য ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের অনুপ্রবেশ ঘটছে। এই দেবী পূজোর পরেই বিসর্জিত হন না।

জলপাইগুড়ি জেলার রাজবাড়িতে যে ভাণ্ডানী দেবী আছেন তিনি ব্যাঘ্রবাহনা। একহাতে তাঁর একটি মাটির ঘট, অন্যহাতে বরাভয় মুদ্রা। তিনি শস্যের দেবীরূপে কোথাও কোথাও বর্ণিতা। এই দেবীর তাৎপর্য সম্পর্কে ডঃ গিরিজাশঙ্কর রায়ের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। "উত্তরবঙ্গের আঞ্চলিক ভাষায় ভল্লুকের নাম ভাণ্ডী। হিংস্র বন্যপশুদের মধ্যে ভাণ্ডীও একটি প্রধান পশু বিশেষ। বনাবৃত উত্তরবঙ্গে অন্যান্য বন্য পশুদের ন্যায় ভাণ্ডীর অত্যাচারও বোধকরি কম ছিল না। কেননা, এতদঞ্চলে ভাণ্ডীর ঝাড়ের নাম যত্রতত্র শুনিতে পাওয়া যায়। ভাণ্ডানী ঠাকুরানী নামকরণের প্রশ্নে এই ভাণ্ডী কোন না কোন প্রকারে জড়িত থাকিতে পারে।

উত্তরবঙ্গের অরণ্য পরিবেশের বাসিন্দারা ভাণ্ডী ইত্যাদি বন্যজন্তুদের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার উদ্দেশ্যে ভাণ্ডানীদেবীর পূজার প্রচলন করিয়াছিল বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। তবে, ভাণ্ডীর অপেক্ষা উত্তরবঙ্গে ব্যাঘ্রভীতি প্রবলতর ছিল বলিয়া ভাণ্ডীর বাহন হিসাবে বাঘ মনোনীত হইয়া থাকিতে পারে।"১৪

ভাণ্ডানী সম্পর্কে জনশ্রুতিগুলো বিচার করলে দেখা যায়, এগুলো সবই ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি-প্রভাবজাত পরবর্তীকালের সংযোজন। কোচবিহারের মহারাজাদের দশভূজা দেবীপূজোও আগ্রাসী ব্রাহ্মণ্যসংস্কৃতি—প্রভাবিত। তবে, এইসব পূজোয় বলিদান প্রথা ইন্দোমোঙ্গলীয় জনগোষ্ঠীর নিজস্ব কৃত্য।১৫ ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি এ বিষয়ে তাদেব কাছে বিশেষভাবে ঋণী।

॥ সূত্রপঞ্জী ॥

১। কিবাত-জনকৃতি—ডঃ স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

২। কোচবিহার দেবীবাডির দুর্গাপূজা—স্থকুমার মুখোপাধ্যায়, ভূমিলক্ষ্মী

৩। পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বণ ও মেলা ১ম খণ্ড ভারত সরকার প্রকাশিত।

৪। ঐ

৫। উত্তরবঙ্গে রাজবংশী সমাজের দেবদেবী ও পূজা-পার্বণ। ডঃ গিরিজাশঙ্কর রায়।

৬। ও ৭। ঐ

৮। জলপাইগুড়ি জেলা শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ।

৯। পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বণ ও মেলা ১ম খণ্ড।

১০। ও ১১। ঐ

১২। উত্তরবঙ্গে ভাণ্ডানীদেবীর পূজা—প্রদীপ ঘোষ। ভূমিলক্ষ্মী।

১৩। রাজবংশীস্ অব নর্থবেঙ্গল—ডঃ চারুচন্দ্র সান্যাল।

১৪। উত্তরবঙ্গে রাজবংশী সমাজের দেবদেবী ও পূজাপার্বণ—ডঃ গিরিজাশঙ্কর রায়।

১৫। কিরাত-জনকৃতি—ডঃ স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।
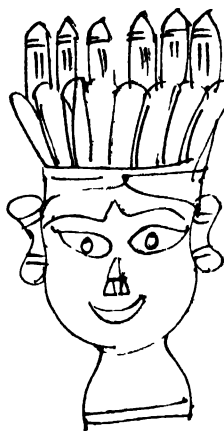
খজাগর। 'ভলভল পূন্নিমার চান' আকাশে দেখা দেবার ছদিন আগে থেকেই পশ্চিম দিনাজপুর জেলার 'দেশী' সমাজে শুরু হয়ে যায় খজাখজি বা খজাগর গান। বলাবাহুল্য, এই পূর্ণিমা কোজাগরী লক্ষ্মী-পূর্ণিমা বলে পরিচিত। এই সময় পঃ দিনাজপুরের কৃষক যুবকেরা দল বেঁধে নানা সাজ করে গ্রামের পথে বেরোয় খজাগজির মাগন তুলতে। সে সময় যে গান গাওয়া হয় তাই 'খজাগর' গান নামে প্রচলিত। তবে, খজাগরের জন্য বিশেষ কিছু গান থাকলেও এর সঙ্গে অন্যান্য হাউসের গান জুড়ে যায়। যেমন,

বধু চোখের ইশারায় কেন মারোরে
তোমার জ্বালায় আমি মরিরে।

অথবা,

নাইয়ারে তুই নাও চাপারে
নাও চাপা, নাও চাপা ওরে নাইয়া
নাও চাপা মোর কূলে।
কলসা ভরায়া দিমু
দুই নয়নার জলে।

বলার দরকার নেই যে উল্লিখিত গান দুটিই প্রেমের গান। দুটি গানই মর্মযন্ত্রণার হলেও প্রথমটির সঙ্গে দ্বিতীয়টির পার্থক্য অনায়াসে ধরা যাবে। দ্বিতীয় গানটির ব্যঞ্জনাও সুদূর প্রসারী। এখানে কথা কম, সুর বেশি।

এই সময়ের আরো দুটি গীত উল্লেখ্য।

১

বাড়ির কাছে চম্পা নদী
ইলুয়া কাশের বনরে
সেখান হৈতে আমার মামা
ভুলাইল মনরে।
বড় মামা হয়গো ভাসুর
ছোট মামা দেওর
মাঝিল মামা সিঁথির সিঁদুর
নানা মোর শ্বশুর।
আগে যদি জানতাম আমি
মামার সথে বিয়ে
বাসর ঘরে মরতাম আমি
গলায় অসি দিয়ে।

অর্থাৎ বাড়ির কাছে চম্পা নদী আর ইলুয়াকাশের বন। সেখানে আমার মেজো মামা মন ভুলিয়ে নিল। যাব ফলে বড়মামা আমার নোতুন সম্পর্কে ভাসুর। মেজো মামা আমার স্বামী আর দাদু আমার শ্বশুর হলেন। এই যদি হবে আগে জানতাম তবে আমি গলায় দড়ি দিয়ে মরতাম।

২

কাকইরে কাকই ডুনো ভিতিদার।
মাথাৎ চড়িয়া কাকই ধল্লে অবতার॥
উলিয়ান গে উলিয়ান কেটুনকাটা তেল
কেটুন কাটা তেল গে বাবুরিতে গেল॥
আজু গে আজু কপালে লেখা
টাকার জোরে বেহা দিলু খড়েনেংড়া?
বাঁশিরে বাঁশি যদি নাগাল পাউং
কুড়ালে চিরিয়া বাঁশি সাগরে ভাসাউং
বন্ধুরে বন্ধু হামা বাড়ি যান
বসবা দিম শীতল পাটি তবলা বাজান।

এই গানটি পূর্বোল্লিখিত গানটি থেকে একেবারেই স্বতন্ত্র। চিরুণী (কাকই)

শাশুড়ী (উলিয়ান), দাদু (আজু), বাঁশি ও বন্ধুকে সম্বোধন করে গান। চিরুণীরে চিরুণী তোর দুইদিকেই তো ধার। মাথায় চড়ে তুই হলি অবতার? শাশুড়ী তুমি তাঁত বুনে যে তেল কিনলে সেই তেল মাথার বাবরি চুলে গেল। দাদু এই ছিল ভাগ্যে লেখা যে, টাকার জন্যে খোঁড়া ন্যাংড়ার সঙ্গে বিয়ে দিলে? বাঁশির নাগাল যদি পাওয়া যায়, তবে তাকে কুড়ুল দিয়ে চিরে সাগরে ভাসিয়ে দেব। বন্ধু, তুমি আমার বাড়িতে যেও। তোমায় যত্ন করে শীতল পাটিতে বসতে দেব আর বাজাতে দেব তবলা।

এই গানটির বিস্তৃত আলোচনা এ প্রসঙ্গে অবান্তর। শুধু এইটুকু বোঝা যাচ্ছে যে, মূল খজাগর উপলক্ষে সমাজ জীবনের নানা চিত্র এবং এদের আমোদে কত বিবিধ ও বিচিত্র সঙ্গীত এসে যুক্ত হয়।

কোজাগরী লক্ষ্মী পূর্ণিমায় দেশী-পলি সমাজে কোন পূজো প্রচলিত নেই। তবে, সংস্কৃতি সমন্বয়ের তাগিদে এখন লক্ষ্মী পূজো হচ্ছে। আসলে, আশ্বিন সংক্রান্তিতে দল ছিটা বা গৃহলক্ষ্মীর ডাক এদের মূল-লক্ষ্মীর ব্রত। কোজাগরীতে শুধু 'খজাগর ঝালাই'। দল বেঁধে গান করে মাগন তোলা। তারপর থানে খজাখজি ঝালান হবে, সেখানে অর্থাৎ গানের দলের কারো অঙ্গনে ধানের গোলার সামনে জড়ো হয়ে বসে খুবই ভক্তিভরে গাওয়া হয় মূল খজাগর গান—

করচ খৈলান মা গো করচ খৈলান
খজাখজি ঝালাই হামরা
শোলের পোহান
করচ খৈলান মাগো করচ খৈলান
খজাখজি ঝালাই হামরা
পূবের মাশান।
করচ খৈলান মাগো করচ খৈলান
খজাখজি ঝালাই হামরা
পশ্চিম মাশান।
করচ খৈলান মাগো করচ খৈলান
খজাখজি ঝালাই হামরা
উত্তর মাশান

কবচ খৈলান মাগো কবচ খৈলান
খজাখজি ঝালাই হামরা
দক্ষিণ মাশান।

অর্থাৎ কবহ কল্যাণ মাগো করহ কল্যাণ। আমরা কোজাগরী পালন করি শোলেব পোনা দিযে। করহ কল্যাণ মাগো করহ কল্যাণ। কোজাগরী পালন করি আমরা পূর্ব, পশ্চিম, উত্তব-দক্ষিণ মশানে গিযে। অর্থাৎ সবদিকেই আমবা কোজাগরী পালন কবি।

এব পবে খজাখোজিব দল নেচে গেযে ওঠে—

ঢেকি উঠি কয যে নারদেব নাতি
শামসুন্দরী ধানকুটে
ফেচাৎ মারে লাথি ॥
মশাব কামড়ে ধান বানে বান
সোনার কামুড়ে ধান বানে বান
ঢেকি উঠি কয যে হামারা দুইভাই
শামসুন্দবী ধান কুটে হামরাই
গীত গাই ॥
মশার কামুড়ে ধান বানে বান
সোনার কামুড়ে ধান বানে বান
মুগর উঠি কয যে সোনা বান্ধা ঠোঁট
শামসুন্দবী ধান কুটে
মুহে করুং গোট ॥
মশাব কামুড়ে ধান বানে বান
সোনার কামুড়ে ধান বনে বান
ভুণ্ডি উঠি কয যে মোব
মাটির তালাঘর
শামসুন্দরী ধান কুটে মোর
বুকের উপর ॥
মশার কামুড়ে ধান বানে বান
সোনার কামুড়ে ধান বানে বান

বারুং উঠি কয় যে চার বাঁধনে দড়
শামসুন্দরী ধানকুটে মুঞ্রে করুং জড়।
মশার কামুড়ে ধান—
কুলা উঠি কয় যে বেত বাঁধা বুক
শামসুন্দরী ধান কুটে কুটি
ফালাউং ফুক ॥
মশার কামুড়ে ধান—
খলা উঠি কয় যে মোর নাম খলাই
শামসুন্দরী মুড়ি ভাজে
পাছা মাঝে জ্বালাই ॥
মশার কামুড়ে ধান—
কাঠা উঠি কয় যে মোর নাম টেপা।
শামসুন্দরী ধান নাপে
মুঞ্রি করুং লেখা।
মশার কামুড়ে ধান—

গানের অর্থ ঃ নারদের নাতি ঢেঁকি উঠে বলে শামসুন্দরী ঢেকির পশ্চাৎদেশে লাথি মেরে ধান কোটে। মশার কামড়ে ধান বানের জোয়ারের মত বাড়ে ॥

ঢেঁকিরা দুই ভাই। ধান কোটায় তার যে শব্দ উঠে তাই তাদের গান। ঢেঁকির মাথার নীচে মুদ্গরের মতো অংশই মুগর। এবং মাথাটি লোহার পাত দিয়ে বাঁধানো। যেহেতু ধানের সঙ্গে সোনার তুলনা হয়, সেজন্য মুগরের ঠোট সোনা বাঁধানো—এমনি তুলনা দেওয়া হয়েছে। গোট হল ধান থেকে চাল ছাড়ানো ॥ যেখানে ঢেঁকির মুগর গিয়ে ধাক্কা মাবে সেই অংশটিতে, যেখানে একটি গর্তের মধ্যে একটি কাঠের খোটা পোঁতা। তাই হল ভুণ্ডি। তাই সে বলছে তার ঘর মাটির তলায়। এবং বস্তুতঃ ঢেঁকির পাড তার উপরই পড়ে। বারুং হল কুশের ঝাঁটা। তা চারিটি বাঁধনে শক্ত। দড় অর্থে শক্ত, দৃঢ়। চারদিকে ধান ও চাল ঢেকিপাড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে যায়। বারুং তাই জড়ো করে।

কুলো বেতে বাঁধা। তার কাজ ফুক অর্থাৎ তুষ ঝাড়া।

খলা হল বড় কড়াই। চাল সেদ্ধ করার বা ভাজার পাত্র।

এখানে সম্পূর্ণ গানটাই ধান কোটা থেকে মুড়ি ভাজা পর্যন্ত বিভিন্ন ক্রিয়া-কর্মের সঙ্গে যুক্ত। একজন কথকতার ভঙ্গিতে সুর করে গান গায়। বাকিরা দোহার তোলে 'মশার কামুড়ে ধান বানে বান।' ধান গাছে মশা নাকি ধান ভাল হওয়ার কারণ—এরূপ তথ্য এই গানে রয়েছে। একজন কৃষককে জিজ্ঞাসা করায় এ তথ্য সম্পর্কে তিনি সায় দিয়েছেন।

খজাগরের গানের শেষে সংগৃহীত চাল ডাল পয়সা প্রভৃতি দিয়ে ভক্তরা খাওয়া-দাওয়া করে॥

উত্তরবঙ্গে লোকযান—কুশমণ্ডী থানার রুয়ানগর শাখাব শিল্পীরা এই গান নৃত্য ও অভিনয় সহলগে নানা জায়গায় করে বেড়ান। 'বাড়ির কাছে চম্পানদী' গানটি আমি খ্যামটা সুরে তাদের গাইতে শুনেছি।

গানগুলি পঃ দিনাজপুর জেলার কচড়া গ্রাম থেকে সংগৃহীত। এগুলির সংগ্রহ মাধ্যম : শ্রীযতীন্দ্রনাথ সরকার।

দীপান্বিতা। উত্তরবঙ্গে রাজবংশী সমাজে দীপান্বিতা পালিত হয় নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। এই অনুষ্ঠানগুলোর মধ্যে অমাবস্যার রাতে কালীপুজো তো আছেই। তবে এই প্রসঙ্গে বলে রাখা দরকার যে উত্তর বাংলায় কালী নানা নামে বছরের বিভিন্ন সময় পুজো পেয়ে থাকেন। বিভিন্ন নামের কালীর মূর্তি থাকুক আর নাই থাকুক গ্রামে গ্রামে তাঁদের থান আছে অসংখ্য। এই রকম কালীর কয়েকটি নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। ওয়াসিয়া কালী, চোরকালী, রটন্তী কালী, সাপ কালী, রাখাল কালী, ঝাপড়ী কালী, বুড়ি কালী, মেছেনী কালী, বহুরা কালী, স্থর কালী, বাঁওকালী, মাদার কালী প্রভৃতি।

কালীপুজো ছাড়া এই সময় রাজবংশীরা (এক) গোরু চুমানি (দুই) গছা দেওয়া বা হুকাহুকি এবং (তিন) চোর খেলা ও চোর চুরণী বা চক-চুন্দী গানের অনুষ্ঠানও করে থাকেন।

গোরু চুমানি: চুমানি অর্থ বরণ, কালীপুজোর পর দিন মতান্তরে কালী-পুজোর আগের দিন রাজবংশী গৃহস্থ তাঁর বাড়ির গাভীগুলোকে এমনকি হালের বলদগুলোকে স্নান করিয়ে তার মাথায় ধান-দুব্বা ও তেল-সিঁদুর দেন। সন্ধ্যায় গোয়ালঘরের সামনে গোরুকে তেল-সিঁদুর দেওয়া হয়। গোরুগুলোর সঙ্গে রাখালকেও বরণ করাই রীতি। রাখাল সেদিন স্নানের পর গৃহস্থের কাছ থেকে নতুন জামা-কাপড় ও মিষ্টান্ন উপহার পান।

গোরু-চুমানি বিষয়ক একটি গান :

ওই শেখালিয়া নাই মোর নশিবে
আইসেক সোয়ামী
চুমাওঁ রে তোক।
ওগে, গোরু চুমাইতে নাগে কি
ধান দুব্বা তুলসী।
আরো নাগে কাঞ্চা হোলোদি।১

শেখালিয়া কথার অর্থ রাখাল। দরিদ্র কৃষক বধূ বলছে, আমার ভাগ্যে রাখাল নেই। স্বামী তো রাখালের কাজ করে, তাই স্বামী আজ তোমাকেই বরণ করি। এই গানটি থেকে বোঝা যাচ্ছে গোরু-চুমানো কাজটি করেন রাজবংশী গৃহস্থের বধূ। গোরু চুমানো অনুষ্ঠানে কি কি দরকার তাও গানটিতে বলা আছে।

গছা দেওয়া : আসামের গোয়ালপাড়া, বাংলাদেশের রাজবংশী অধ্যুষিত জেলাগুলোতে এবং জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, দারজিলিং জেলায় গছা দেওয়া নামে অনুষ্ঠানটি প্রচলিত। আর পশ্চিম দিনাজপুর ও মালদহে এই অনুষ্ঠানটির অন্য নাম হকাহুকি। তবে গছা দেওয়া ও হকাহুকির উদ্দেশ্য একই হলেও কৃত্যটির মধ্যে কিছু পার্থক্য রয়েছে। এখানে শুধু গছা দেওয়ার কথাই বলা হল। কালীপূজোর দিন সন্ধ্যায় এবং কোথাও কোথাও পরের দিন বাস্তুঠাকুরের থানে চারটি, বাড়ির প্রতিটি ঘরের সামনে দুটি করে কলাগাছ পুঁতে মাটি সুন্দরভাবে লেপে দেওয়া হয়। অধিকারী এসে প্রথমে তুলসীমঞ্চে পূজো করেন। তারপর যেখানে চারটি কলাগাছ দিয়ে মণ্ডপ তৈরি হয়েছে, সেখানে গিয়ে পূজো দেন। মাটির প্রদীপ বা চেরাগ বাতি সরষের তেলে নিষিক্ত করে জেলে দেওয়া হয়। বাড়ির মেয়েরা পরে অন্যান্যরা কলাগাছের নীচে প্রদীপ জেলে দেন। পরদিন ভোরবেলা লোকজন ঘুম থেকে জেগে ওঠার আগেই সমস্ত কলাগাছ তুলে নিয়ে নিকটস্থ কোনও পুকুর বা নদীতে ফেলে দেওয়া হয়।২

চোরখেলা, চোর চুরণী গান বা চক চুন্দি : গোটা উত্তরবঙ্গেই এই গান।

এই রচনাটির জন্য গ্রন্থ ঋণ : ১। প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত ২। উত্তরবঙ্গে রাজবংশী সমাজের দেবদেবী ও পূজা-পার্বণ।

তবে সর্বত্রই গানের বিষয়বস্তু এক নয়। পশ্চিম দিনাজপুর মালদা জেলার রাজবংশী দেশী পলিদের মধ্যে চৈতন্যদেবের প্রভাবে চোর-চুরণী গানের এক বিশেষ তাৎপর্য সৃষ্টি হয়েছে। সে আলোচনা এখানে নয়। তিস্তার পূবদিকে ধুপগুড়ি থানায় কালীপুজোর পর দিন ভোরবেলা থেকে একটি আচার পালন করা হয়। গ্রামের ছেলেরা কখনও দলবদ্ধভাবে কখনও এককভাবে নানা রকমের মুখোশ পরে কিংবা রং মেখে গৃহস্থের দুয়ারে এসে চিৎকার করে বলে চোর, চোর। তারপর গৃহস্থের সঙ্গে নানা রঙ্গ তামাসা করে গান গেয়ে চাল ডাল বা পয়সা নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। এই রকম কার্তিক পূর্ণিমার আগের দিন পর্যন্ত চলে। পশ্চিম দিনাজপুরের গ্রামে আমি এই বিষয়ে একটি গান শুনেছি :

ইয় বছরকার জম্পুইগিলা
বেজায় ধইরাসে
হলফল হলফল করে
অসিয়া, খাবামনাইসে।

এই বছরের জলপাইগুলো গাছে প্রচুর ধরেছে। দেখতেও ভারি সুন্দর। তাই খেতে মন হয়েছে।

চোর-চুরণী গান তিস্তার পশ্চিমদিকে বিশেষত পাহাড়পুর রংধামালী থেকে শুরু করে মঙ্গলঘাট পর্যন্ত অঞ্চলে সাধারণত কালীপুজোর অমাবস্যার পরবর্তী অষ্টমী তিথি থেকে পবরর্তী পূর্ণিমা পর্যন্ত চলতে থাকে। এইসব অঞ্চলে একজন সাজে চোব আব একজন সাজে চুরণী অর্থাৎ চোঁরের বউ। তারপর উক্তি-প্রত্যুক্তির মধ্য দিয়ে চলে গান। এই গানের মধ্য দিয়ে গ্রামের সামাজিক, অর্থ নৈতিক অবস্থার পর্যালোচনা করা হয়। বন্যা, ঝড়, দুর্ভিক্ষ নির্বাচন, অবৈধ প্রেম সব কিছুই গানের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত হয়। চোর-চুরণী গানকে লোকনাট্য বলা চলে। তবে, নাটক যেমন আদি-মধ্য-অন্ত্য কাহিনীযুক্ত, চোর-চুরণীর গানগুলির কাহিনী এই রকম ধারাবাহিকতা যুক্ত নয়। ছোট ছোট ও খণ্ড খণ্ড।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য 'দীপান্বিতা' শব্দটি সাধারণ রাজবংশী সমাজে অপরিচিত।

হুকাহুকি ও চোরপূজা। শারদীয় শুক্লা তিথি তার চাদর গুটিয়ে নেয় প্রকৃতি থেকে। ধীরে ধীরে নেমে আসে হৈমন্তী কৃষ্ণা। পশ্চিম আকাশে সূর্য ডুবতে না ডুবতেই মাঠে মাঠে হেঁউতি ধানের উপর কৃষ্ণপক্ষের আঁধার ঘনিয়ে আসে। ক্রমশ সে আঁধার নিকষ কালো হয়ে ওঠে। লোক-জীবনে তখন ব্রত উৎসবের প্রকারভেদ ঘটে। তাই দেখি উত্তরবঙ্গের রাজবংশী দেশী সম্প্রদায় গ্রামে গ্রামে এই সময় এক সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের ব্রত উদযাপনে ব্যস্ত। কেউ বলে হুকাহুকি, কেউ বলে উল্কা। আবার কারো মতে চোরচটিয়া বা ওয়াসিয়া।

কথায় বলে, কার্তিক মাসের অমাবস্যা সে বড় ঘোর ও ভয়ঙ্কর। এই তিথিতেই মহাকালীর পূজা। এই তিথিতেই দেখি চোর-পূজার ব্যবস্থা। উত্তরবঙ্গে তাবৎ রাজবংশী সম্প্রদায় এ তিথিতেই যে গান বাঁধেন তার নাম চোর-চুরনী। শুধু অঞ্চলভেদে এর প্রকারভেদ।

প্রথমে বলি 'চোর পূজার' কথা।

কার্তিক মাসের অমাবস্যায় কালী-পূজার রাত্রে পূজাটি শুরু। গ্রামে যাদের বাড়িতে চোর পূজা প্রচলিত, তারা গ্রামের মালাকারদের কাছ থেকে শোলার মুখোশ তৈরি করিয়ে নেয়, তারপর সেই বাড়ির কোন একটি ছেলে সেই মুখোশ পরে বাড়ি বাড়ি ঘুরে অর্থাদি সংগ্রহ করে। যাদের বাড়িতে এই পূজো প্রচলিত তাদের বাড়িতে এই অর্থ সংগ্রহ করা হয় না ; সংগৃহীত অর্থ দিয়ে এই পূজা করা হয়ে থাকে। শোলার মুখোশটিকেই পুজো করা হয়। এবং

সেই সঙ্গে পায়রা বলি দেবার প্রথাও আছে। এই পূজায় স্থানীয় মালাকারই পুরোহিত।

চোরপূজা বহুল প্রচলিত নয়। কিন্তু উত্তরবঙ্গের রাজবংশী দেশী সম্প্রদায়ের মধ্যে এই সময় যে ব্রত বা উৎসব প্রচলিত তার নাম হকাহুকি। কালীপুজোর একদিন আগে করলে তার নাম চোরচটিয়া আর কালীপূজোর দিন করলে তাকে বলা হয় ওয়াসিয়া। পঃ দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর মহকুমার রহৎপুর গ্রামে দেশী-পলিদের মধ্যে এই সময় এই ব্রত 'উল্কা উৎসব' নামে প্রচলিত।

উল্কা উৎসব প্রকৃতপক্ষে কার্তিক মাসের অমাবস্যা তিথিতে অনুষ্ঠিত হলেও আশ্বিন মাসের সংক্রান্তির দিন থেকেই এর শুরু।

কার্তিক মাসের অমাবস্যার সন্ধ্যায় গ্রামবাসীরা নিজ নিজ বাড়ির এবং ধানের ক্ষেতে প্রদীপ জ্বালান। কেউ কেউ আবার ওইদিন ধানের ক্ষেতে অস্থায়ী চালাঘর তৈরি করেন। সেখানে যে পূজোর আয়োজন হয় তার নাম 'নিশিপূজা'।

এইদিন সন্ধ্যায় গ্রামের ঘরে পাটকাঠিব গোছা দিয়ে উল্কা তৈরি করানো হয়। এর অপর নাম সিজা। সন্ধ্যায় এই উল্কাগুলিকে আকাশে মৃত পূর্বপুরুষদের উদ্দেশে ছুঁড়ে দেওয়া হয়।

প্রায় অনুরূপ হলেও হকাহুকি ব্রতের স্বাতন্ত্র্য আছে।

অমাবস্যা তিথিতে ব্রতে অংশ গ্রহণ করেন যে মেয়েরা তারা একটি ডালায় তেল সিঁদুর পাঁচরকম শস্য, (পাশোসি) চেরাগ বাতি প্রভৃতি সাজিয়ে রাখেন। সেইসঙ্গে কাঁচা হলুদ আর দূর্বা ঢেঁকিতে কুটে তেল দিয়ে মেখে সেই ডালার এক অংশে রেখে দেন। এই ডালার নাম স্থানীয় ভাষায় 'ঢন'।

পাটকাঠির গোছা ইলুয়াকাশের খড় দিয়ে বেঁধে তৈরি করা হয়। আর মাটির ঘড়া বা গঙ্গাও এই সঙ্গে নির্মিত হয়। এই সিজাগুলিকে তেল সিঁদুর মাখিয়ে আঠিয়া কলা, ভাদই ধান এবং পাঁচরকমের শস্য (পাঁচ+শস্য=পাঁশোসি) দিয়ে সাজিয়ে বাড়ির দেবস্থানে রাখা নিয়ম। সন্ধ্যা-বেলা দেবস্থানে মাটিতে চাঁদ, সূর্য এবং 'নাঙ্গল জুয়াল' অঙ্কিত হয়। দেবস্থানের পূজা হয়ে গেলে সিজার আঁটিগুলি আগুন দিয়ে জ্বেলে

ব্রতের শরিকরা বাড়ির পুকুরঘাটে গিয়ে উপর দিকে ছুঁড়ে দেবে। সেই সময় মৃত আত্মীয় স্বজনদের উদ্দেশে বলা হবে—আলোই দেখ। যেমন, 'আজুরে আজু, আলোই দেখ' (দাদুরে দাদু আলো দেখ), অথবা আতারে আতা, আলোই দেখ' (দিদিমাগো দিদিমা, আলো দেখ)। এরপর সমস্বরে উচ্চারিত হবে, 'হকারে হুকি আইজ থেকে পরম মুক।' এরপর অর্ধেক সিজার আটি ডাঙ্গায় রেখে বাকি অর্ধেক জলে পুঁতে দেবে।

বাড়িতে ফিরে এসে ব্রতীরা যে যার বৌদি এবং বোনের কপালে কাজল ও সিদুঁরের ফোঁটা দেবে। এবং সেই সঙ্গে সিজা ভেজানো জল এবং পাশোসি মাথায় ছিটিয়ে দেওয়া হবে।

হকাহুকির ঢন গৃহস্থ বাড়িতে যত্ন করে রেখে দেবেন সকলে।

কালীপুজোর দিন ভোরে বাড়ির মেয়েরা 'গরুচুমা' অনুষ্ঠান করে। সেইদিন সাত সকালে বাড়ি-ঘর-দুয়ার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ক'রে কাঁচা হলুদ ও দুর্বা ঢেঁকিতে কুটে সরষের তেল দিয়ে কলার ঢনায় মাখে। তারপর তারা দল বেঁধে গোয়াল ঘরে গরুর কপালে তা মাখিয়ে দেয়। সেই সঙ্গে সিঁদুরও মাখায়। এরই নাম 'গরুচুমা'। গরুর গলায় সেদিন শোলার ফুল বেঁধে দেওয়া হয়। আর কলার পাতা ও কলার 'ঢাডি' দিয়ে তৈরি 'চটপুটিয়া' গোয়ালঘরে রেখে দেওয়া হয়।

বৈরাটের বুড়ি ॥ পশ্চিম দিনাজপুবেব একটি গ্রাম বৈবাহাট্টা। জনশ্রুতি বৈরাহাট্টা মহাভারত কথিত বিবাট নগব। পাণ্ডবগণ অজ্ঞাতবাসকালে এখানে এসেছিলেন। এখন এই বৈরাহাট্টা গ্রাম জঙ্গলাকীর্ণ। এখানে প্রধানত দেশী সম্প্রদায়ের বাস। তাদেব জীবিকা কৃষিকাজ।

এখানে তিনটি প্রাচীন দিঘি আছে। তাদেব নাম গড়দিঘি, আলতা দিঘি এবং মালিয়ান দিঘি। স্যার ফান্সিস হ্যামিলটন বুকানন ১৮৮০-৮৯ সালে এই গ্রাম ও দিঘি সম্বন্ধে যে বিববণ দিয়েছেন তা খুবই কৌতুহলজনক ও ঐতিহাসিক।

এখন শুধু এইটুকু বলা যায় যে এই দিঘিগুলি প্রাচীন কোন রাজধানীর ইঙ্গিতবহ। এই গ্রামের প্রধান রাস্তা যে ইঁট দিয়ে বাঁধানো ছিল এবং রাস্তার দুপাশে অনেক পাকাবাড়ি ও মন্দির ছিল, তা এখনো বোঝা যায়।

এই বৈরাহাট্টা বা বৈরাট গ্রামের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য পূজা ও মেলার নাম বুড়ীকালী। প্রতি বৎসব কার্তিক মাসের শেষ বুধবার থেকে বুড়ী কালীর পূজা শুরু হয়। তদুপলক্ষে বসে মেলা। চলে তিনদিন ধরে। এখানে বলে রাখা ভাল, এই অঞ্চলে একদিনের জন্য কোন উপলক্ষে মেলা বসলে তার নাম হয় বাজার। সেই বাজার একাধিক দিন ধরে চললে বলা হয় মেলা।

গ্রামের আমতলায় একটি চালাঘর আছে। তার সামনে বেশ খানিকটা অংশ জুড়ে চত্বর, পাশে একটি পুকুর। সমস্তই দেবোত্তর সম্পত্তি। আমতলার চারপাশে অনেকগুলি বড় বড় গাছ। বট, অশ্বত্থ, শিমূলও আছে। তাছাড়া নিকটেই রয়েছে একটি বাঁশবন। ফলে, চারদিকের পরিবেশ ছায়াময় স্নিগ্ধ।

আমতলার চালাঘরে বুড়ী কালীর কোন মূর্তি নেই। শুধু মাত্র কার্তিক মাসে পূজোর সময় কাঠের তৈরি কতকগুলি কালীর মুখোশ সেই চালাঘরে রাখা হয়। কিন্তু এই মুখোশগুলির রঙ কালো নয়। কোনটির রঙ হলুদ, কোনটি সাদা আবার কোনটি শ্যামবর্ণ। প্রতিটি মূর্তিতে জিহ্বা রয়েছে। মাথার মুকুট শোলার। এছাড়া আরো কয়েকটি কাঠের মুখোশ রয়েছে সেই চালাঘরে। সেগুলি কোন দেব-দেবীর বলে মনে হল না। এই গ্রামে একটি অসাধারণ মুখোশ দেখেছি। তার নাম কেউ বলেন মাশান, কেউ বলেন সিংহলরাজ। একটি কুলোর পিঠে ভূষো কালি দিয়ে রঙ করা। সাদা খড়ি দিয়ে চোখ মুখ আঁকা। এছাড়া বৃহদাকার সাদা রঙের একটি মুখোশের নাম বুড়ী চণ্ডী।

এইসব মুখোশ তৈয়ার করেন স্থানীয় মালাকারেরা। কালীর পূজো হয় লৌকিক মতে। পূজারী কোন ব্রাহ্মণ পুরোহিত নন। দেশী সম্প্রদায়ের অধিকারী। মন্ত্রও অ-সংস্কৃত আঞ্চলিক ভাষায়। পূজোয় তিনদিন ধরে আমতলায় যে গান করা হয় তার নাম চণ্ডীআলা। আসলে চণ্ডীআলা গান উত্তরবঙ্গের (মালদহের) প্রখ্যাত কবি মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্য। এই গানের প্রধান গায়েন নিজেকে মানিক দত্তের বংশধর বলে দাবি করেন।

এখানে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের বণিক খণ্ড অংশের ধনপতি লহনা খুল্লনা কাহিনী গীত হয়। চণ্ডীর অনুচরদের সঙ্গে রাজার সৈন্যদের লড়াই অংশ অভিনীত হয় নৃত্যের মাধ্যমে। ফলে কেউ সাজে হাতি, কেউ ঘোড়া। আবার কোটাল সেনাপতির সাজেও সজ্জিত হয় কেউ। বিভিন্ন চরিত্রের জন্য মুখোশের ব্যবহারও বিভিন্ন। কিন্তু পরিধেয় বস্ত্রের কোন পরিবর্তন হয় না। অর্থাৎ যে যেমন পোশাক পরেছিল যেমন ধুতি, পাজামা, জামা অথবা জামাহীন উদোম গা, শুধু মুখের ওপর চড়িয়ে নেয় একটি মুখোশ তা বুড়ি চণ্ডী বা কোটালের—যারই হোক না কেন। তাই হয়তো পূজোর মণ্ডপে কালীর মুখোশের পাশে কিছু অন্যান্য মুখোশও দেখেছিলাম। বলাবাহুল্য এ সমস্ত মুখোশই কাঠের তৈরি।

বুড়ি পূজার শেষদিনে ভক্তের দল মণ্ডপ থেকে সব মুখোশ তুলে সিন্দুর চুমানো মাথানো খড়্গ নিয়ে আমতলার উঠোনে ঢাকের বাদ্যের সঙ্গে উদ্দাম নৃত্য করে। প্রথমে তারা গোল হয়ে নৃত্য আরম্ভ করে। তার-

পর, ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ে সারা চত্বরে। এদের নৃত্যের ভঙ্গিতে দুটি সাধারণ রূপ লক্ষ করা যায়। সে আলোচনা অবশ্য স্বতন্ত্র।

নাচের দলের মধ্যে যার হাতে খড়্গ থাকে, ক্রমে তার মধ্যে দেবী ভর করেন। স্থানীয় ভাষায় একে বলা হয়, পাতা পড়া বা ঘোড়া পোড়া। অবশ্য অপদেবতার ক্ষেত্রেই 'পাতা' কথাটি প্রযোজ্য। ভর-পড়া অবস্থায় তার চেহারা হয় ভীষণ। তাকে অনেক স্তুতি মিনতি করে ঠাণ্ডা করতে হয়। নয়তো তার উদ্দাম নৃত্য সহজে থামতে চায় না। সে নৃত্য দেখে উপস্থিত অনেকেই ভয় পায়।

ভর-পড়া ভক্ত আমতলাব কাছেই একটি গাছের তলায় বসে। তাকে ঘিরে থাকে নানা গ্রাম থেকে ছুটে আসা সমস্যা-জর্জর ভক্তের দল। এই ভর-পডা লোকটিকে তখন সবাই মনে করে বুড়ি কালী। তাকে সবাই ভক্তি ভরে প্রণাম নিবেদন কবে। কাতরস্বরে জানায় নানা সমস্যা। দুরারোগ্য রোগ থেকে আর্থিক ও পাবিবারিক নানা সমস্যার সমাধানের কথা জেনে নিয়ে এবং মানৎ দিয়ে তারা বাড়ি ফেরে। সকলেরই যে সমস্যার সমধানের কথা ভর বা পাতা অথবা ঘোড়া—পডা বলে তা নয়, কাউকে কাউকে নিরাশও করে দেয়। আমি কত কত বিকলাঙ্গ শিশুকে এই ভরের কাছে নিয়ে আসতে দেখেছি। গ্রামের মানুষ ভয় ও ভক্তিভরে বিশ্বাস করে এই ভরকে। এই বিশ্বাসের ফলও নাকি অনেকে পেয়ে থাকে। তাই এ অঞ্চলে প্রচলিত—যে বৈরাটের বুড়ি বড জাগ্রত।

মাঘীব। বাংলার গ্রামে গ্রামে প্রভাতে সন্ধ্যায় বিভিন্ন তিথিতে কত ব্রতই না উদ্‌যাপিত হচ্ছে—কতটুক্‌ তার জানি। এইসব ব্রত অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে লুকিয়ে থাকে দেশের প্রাচীন ধারাবাহিত সংস্কৃতির কথা। যেগুলো বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখলে অনেক অজানা তথ্য উদ্‌ঘাটিত হয়ে পড়ে। যদিও বিচার বিশ্লেষণের জন্য এ নিবন্ধ নয়। প্রাধানতঃ পরিচয় দেওয়াই এই নিবন্ধের উদ্দেশ্য।

উত্তর বাংলার পশ্চিম দিনাজপুর জেলার একটি উল্লেখযোগ্য ব্রতের নাম 'মাঘী-ব'। এই ব্রত যাঁরা পালন করে থাকেন তাঁরা নিজেদের দেশী বলে পরিচয় দেন। এ ব্রত একান্ত তাঁদেরই নিজস্ব ব্রত বলে দাবি করা হয়। এ জেলায় অন্য কোন সম্প্রদায় এ ব্রত করেন না। এই প্রসঙ্গে দেশী সম্প্রদায়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় উল্লেখ করা যেতে পারে।

নৃতত্ত্ববিদদের মতে 'দেশী' বা 'দেশীয়া' সমাজ 'রাজবংশী' জাতি সম্প্রদায়ভুক্ত। সারা উত্তরবঙ্গ—(বাংলাদেশের দিনাজপুর, রংপুর ধরে এবং আমাদের দার্জিলিঙ বাদ দিয়ে) জুড়ে কোচ ও রাজবংশী আদিনিবাসী লোকের সন্ধান পাওয়া যাবে। নৃতত্ত্ববিদ রিজলে সাহেবের মতে রাজবংশী ও কোচ কোন আলাদা জনজাতি নয়। এঁরা নানা কারণে একের সঙ্গে অন্যের পার্থক্য সৃষ্টি করেন। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে তৎকালীন জনগণনা অধিকর্তা মিঃ এল এল এস ওম্যালী সাহেব তাঁর প্রতিবেদনে রাজবংশী ও কোচদের আলাদা দুটি জনজাতি হিসাবে দেখেছেন। বলা বাহুল্য, তিনি রিজলে সাহেবের সঙ্গে একমত হননি।

তবে 'দেশীয়া' সম্পর্কে কোন দ্বিমত নেই। ওরা রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতিরই অন্তর্ভুক্ত। এই জেলায় 'পলি' 'পলিয়া' অথবা 'পালিয়া' নামে অসংখ্য লোকের সন্ধান পাওয়া যাবে। যাঁদের অনেকেই নিজেদের ক্ষত্রিয় বলে পরিচয় দেন। অথচ চেহারায় আকৃতিতে কোথাও দেশীয়াদের সঙ্গে পার্থক্য ধরা কঠিন। এরা সবাই হয়তো মূলে মোঙ্গলীয় বড়ো জনজাতি। সামাজিক নানা কারণে দেশীয়াদের সঙ্গে এদের প্রভেদ বর্তমান। দেশীতে 'পলি' বিধিমত কোন বিবাহ চলে না। পলি বা পলিয়াদের নিজস্ব পুরোহিত এখন দেখা যায় না কিন্তু দেশীয়াদের পুরোহিত নিজেরাই। শ্রাদ্ধ, বিবাহ, পূজা-পার্বণে নিজেরাই পুরোহিতের কাজ চালান তবে এঁরাও এখন ব্রাহ্মণ পুরোহিত ব্যবহার করছেন। এঁরা নগুণ উপবীত ধারণ করেন। এঁদের ঘরে ঘরে ধান কোটার জন্য ঢেঁকি। পলিরা কেউ কেউ ঢেঁকি ব্যবহার করলেও 'ছামগাহিন' অধিক সংখ্যায় ব্যবহার করেন।

দেশীয়ারা নামের সঙ্গে উপাধি ধারণ করেন প্রধানত 'দেবশর্মা'। আবার 'সরকার' উপাধিটাও বেশ প্রচলিত। 'দেবশর্মা' 'সরকার' উপাধিগুলো যে অর্বাচীন সেটা বোঝা দুষ্কর নয়। নামের সঙ্গে 'দেশী' উপাধিটাই মূল। তার প্রমাণ দলিল দস্তাবেজ ছাড়াও গ্রামে গ্রামে এখনো রয়েছে। তবে 'দেশী'রা সংখ্যায় খুব বেশি নয়—পঃ দিনাজপুর জেলাতেই তাঁদের বাস সর্বাধিক।

এ জেলার গ্রামে গ্রামে ঘুরে দেখেছি 'ব্রত'-কে 'ব' বলা এই অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য। ভাষাতত্ত্বের নিয়ম-অনুসারে ব্রত হয়েছে 'ব'। যেমন বিষহরা-ব (ব্রত), চণ্ডী-ব লক্ষ্মী-ব প্রভৃতি।

দেশী সম্প্রদায়ের মাঘী-ব্রত পূর্ববঙ্গের (অধুনা বাংলাদেশ) মাঘমণ্ডলীর ব্রত কথা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। 'মাঘী-ব' মাঘ মাসের মধ্য বা তৃতীয় রবিবার সন্ধ্যার পূর্বে সূর্যাস্তের ঠিক পরমুহূর্তে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। মাঘমণ্ডলী ব্রতের মতোই এতে মেয়েরাই একমাত্র অংশী। তবে মালাকার বা পুরোহিত হন পুরুষ। মাঘমণ্ডলীর ব্রত সূর্যোদয়ের পূর্বে পুকুর ঘাটে হয়ে থাকে। সেখানে উপাস্য দেবতা 'সূর্য'। কিন্তু 'মাঘী-ব'-র উপাস্য দেবতা 'ধরম ঠাকুর'। কিন্তু এ ধরম ঠাকুর রাঢ় অঞ্চলের কিংবা জলপাইগুড়ি জেলার বর্মণ রাজবংশী সম্প্রদায়ের ধরম ঠাকুর থেকে ভিন্ন। এই ঠাকুরকে দেশীরা বিষ্ণুর অবতার রূপে দেখে থাকেন। এই অঞ্চলটি যেন বিষ্ণুরই প্রাধান্য। এঁদের প্রধান উপাস্য দেবতাও বিষ্ণু।

এঁদের আচার-ব্যবহার চলা ফেরার মধ্যেও বৈষ্ণবোচিত নম্রতা ধীরতা ও স্থিরতা বর্তমান। তাই বলে এরা প্রব্রজ্যাবিলাসী নন; নির্বল আলস্য এদের ঘৃণার বস্তু। মনের দিক থেকে এঁরা সুঠাম ও দৃঢ়। এরা সুভদ্র সজ্জন অতিথিপরায়ণ।

'মাঘী-ব'তে মেয়েরা প্রার্থনা করেন ধর্মের কাছে। ধর্মরক্ষার কামনা করেন তারা, পরিবারের সকলের ধর্মে যেন মতি থাকে, ফসল যেন ভাল হয়। এঁদের কাছে ধর্ম হল কৃষিকর্ম। কেননা কৃষিভিত্তিক এঁদের জীবন, এঁদের কৃষ্টি। এই অনুষ্ঠানের ক্রিয়াকর্মের মধ্যে নিহিত রয়েছে এর মর্ম কথা।

গ্রামে 'ধরম' ঠাকুরের থান থাকলে ভাল। সেই থান তলায় মাটি খোদাই করে তৈয়ারী হয় ধরম ঠাকরের বিশালকায় মূর্তি। যদি থান তলা না থাকে তো কৃষি জমি খোদাই করে নির্মিত হবে মূর্তি। এর জন্য কোন বিশেষ শিল্পীর দরকার নেই। আশ্চর্যের সঙ্গে লক্ষ করা গেছে বালকেরা এবং মেয়েরা এই শিল্পকর্ম সম্পাদন করে থাকে। শিল্পকর্মটিতে 'স্বস্তিকা' চিহ্নের কথা স্মরণ করায়।

মূর্তিটি উদ্বাহু চৈতন্য ভঙ্গিতে। হাতের কনুই ভাঙ্গা। পা দুটি বিস্তৃত। বিশাল দুটি চোখ শান্ত স্থির। এর শিরোদেশে নাভিমণ্ডলে এবং নিম্নে জননাঙ্গের স্থানে একটি করে মোট তিনটি ছোট কলাগাছ প্রোথিত হয়। সেই তিনটি গাছে তেল সিঁদুর ঢালেন মেয়েরা। এর কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ নেই। যার যেমন 'মানত' বা 'মানসিক' সেই পরিমাণ অনুসারে তেল-সিঁদুর ঢালা এই ব্রতের নিয়ম। মাঘমণ্ডলী ব্রতে অংশ গ্রহণ করে শুধু কুমারী মেয়েরা। কিন্তু এ ব্রতে কুমারী-সহ সধবা, বিধবা সবাই অংশ গ্রহণ করতে পারে। মূর্তিটির পদদ্বয় দক্ষিণে, শিরোভাগ উত্তরে। অথচ বাংলাদেশে প্রবাদ রয়েছে উত্তরে মাথা দিয়ে শুতে নেই। কিন্তু এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে পূর্ব ও দক্ষিণবঙ্গের চিন্তাধারা থেকে এরা সম্পূর্ণতঃ পৃথক।

মূর্তিটির দেহের ওপর ভোগ হিসাবে বসানো হয় সারি সারি উখুরা, মুড়কি ভর্তি হাঁড়ি। দুধ, কলা ও চিনি।

এই ব্রত শুরু হয় সারিবদ্ধ মেয়েদের ধরমঠাকুরকে বেষ্টন করে পাঁচবার প্রদক্ষিণ করার মধ্য দিয়ে। প্রদক্ষিণান্তে মূর্তিটির পূর্বদিকে ও পশ্চিম দিকে দাঁড়িয়ে দু'-দুবার আতপ চাল, কড়ি, পয়সা, ফল, কলাই এবং পাঁচরকমের শস্য (লৌকিক নাম 'পাশোসি') ধরম ঠাকুরের দেহের ওপর দান করা হয়। এই শস্যদানের নানা ভেদ রয়েছে। সে বছর যে যেমন

শস্যের ফলন চায়, সে তেমন সেই শস্য দান করবে।

এরপর মালাকার বা পুরোহিত মন্ত্র পড়েন। সে মন্ত্র বলা বাহুল্য অসংস্কৃত। অথচ আমাদের পরিচিত বাংলা নয়। বাংলার উত্তরাঞ্চলের মৌখিক ভাষা কোচ-রাজবংশী-মৈথিলি প্রভাবজাত। এই ভাষায় এঁরা সবরকম মনের ভাব প্রকাশ করে গান করেন, সুর তোলেন। (যদিও দেশীরা বলেন তাঁদের ভাষার সঙ্গে পলি বা অন্য কারো মিল নেই। তবে এ ভাষা নিঃসন্দেহে বাংলারই উপভাষা।)

মন্ত্রের বক্তব্য : ধরমের প্রতি মতি রাখার প্রার্থনা, ভাল শস্যের, সুস্থ শরীরের কামনা।

যাঁরা মানত করেন 'ধরমের' নামে, তাঁরা সারাদিন থাকে উপবাসী। ব্রত শেষে সন্ধ্যের পর আতপ চালের ভাত খেয়ে উপবাস ভঙ্গ করেন।

বিভিন্ন গ্রামে এই ব্রতানুষ্ঠান আর মূর্তি দেখে উপস্থিত পুরোহিতকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, মাঘমাসের মধ্য-রবিবার এই পুজো করার পেছনে কি কারণ বর্তমান! এবং কলাগাছ তিনটি কিসের প্রতীক ? বলা বাহুল্য উত্তর শুধু পেয়েছিলাম, এটাই—নিয়ম। এই নিয়মই চলে আসছে।

জলপাইগুড়ি অঞ্চলে 'বর্মণ' উপাধিভুক্ত রাজবংশীরা ধর্মের পূজা করেন। কিন্তু পূজাপদ্ধতি তাঁদের এরকম নয়। স্বর্গত ডঃ চারুচন্দ্র সান্যাল 'রাজবংশীস্ অব নর্থবেঙ্গল' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে ধর্ম ঠাকুর সূর্যের এবং শিবের দেবতা। সূর্যের দেবতা বলে ধরম ঠাকুরের পূজো হয় রবিবার। কিন্তু মাঘমাসের মধ্য রবিবার কিনা সেটা তিনি উল্লেখ করেন নি।

জলপাইগুড়ি অঞ্চলের রাজবংশীরা শৈব। কিন্তু পশ্চিম দিনাজপুরের রাজবংশী দেশীরা প্রধানতঃ বৈষ্ণব। জলপাইগুড়ির ধরম ঠাকুর শিব ও সূর্যের দেবতা; পশ্চিম দিনাজপুরের দেশীদের ধরমঠাকুর বিষ্ণু এবং সূর্যের দেবতা। দুই তরফেই সূর্যের দেবতা মিলটা রয়েছে। পূর্ববঙ্গের মাঘমণ্ডলী ব্রত কথায় ঊষাকালে সূর্য ওঠানোর বন্দনা। জলপাইগুড়ি অঞ্চলে ধরমের পূজা হয় ভোরবেলা। কিন্তু পশ্চিম দিনাজপুরের দেশী সম্প্রদায়ের ধরম ঠাকুরের পূজা হয়ে থাকে সূর্যাস্তের পর। মাঘী ব্রতের এখানেই বৈশিষ্ট্য।

গ্রামের লৌকিক দেবতা আসলে কৃষি-দেবতা। কৃষি-বিযুক্ত কোন চিন্তা

এঁদের মধ্যে আসন নিতে পারে না। এদের ধর্ম সংস্কৃতি সমস্তই কৃষি কেন্দ্রিক। কৃষি এঁদের প্রাণ, এঁদের জীবন।

মাঘমাসে কৃষকের হাতে খুব বেশি কাজ থাকে না। শুধু তখন সে ব্যস্ত ক্ষেত-ভূমির প্রস্তুতি রচনায়। নবান্নের পর মাঘ মাসই শ্রেষ্ঠ সময়। মধ্য রবিবার মঙ্গল সূচক। আদি-অন্তের সন্ধি। নাভিমূলে শিরোদেশে তাছাড়া জননাঙ্গে কলা-গাছ এবং গোটা ব্রতটির সময় ও নানা আচারে লুকিয়ে আছে হিন্দু ও বৌদ্ধতন্ত্রের কোন ব্যাখ্যা।

সর্বপ্রথম যে দুটি গ্রামে আমি এই ব্রতানুষ্ঠান দেখি তা হলো রুয়ানগর এবং খরচুনা। থানা—কুশমণ্ডী। আমার সঙ্গী ছিলেন হরেন দেবশর্মা (বাঘন, থানা কালিয়াগঞ্জ) এবং মলিন সরকার (দিনোর সাপাড়া, থানা কুশমণ্ডী) এঁরা উভয়েই 'দেশী' সম্প্রদায়ভুক্ত।
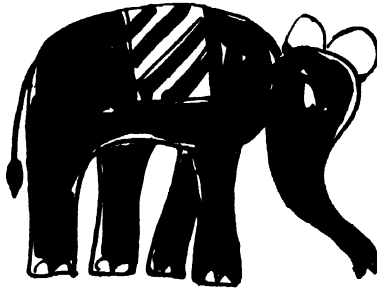
কাষ-ব ও রাজা গণেশ ॥ বাংলার প্রচলিত ব্রতগুলিতে মেয়েদেরই প্রাধান্য। কিন্তু উত্তরবঙ্গে প্রচলিত এমন একটি ব্রতের কথা জানি যেখানে মেয়েদের কোন স্থান নেই। সেই ব্রতের নাম 'কাষ-ব' অথবা 'কাস-ব'।

এই ব্রতের প্রধান ব্রতীরা অধিকাংশই 'তাঁতি গণেশ' সম্প্রদায়ভুক্ত। অথচ এটি যে গণেশ সম্প্রদায়ের নিজস্ব ব্রত নয় তার প্রমাণ আছে। খবর নিয়ে জেনেছি নেপাল, পূর্ণিয়া ও পশ্চিম দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর মহকুমায় বসবাসকারী গণেশ সম্প্রদায় *এই ব্রতের নাম জানেন না।

এই ব্রত সারা উত্তরবঙ্গে মাত্র দুটি গ্রামে এখনো প্রচলিত। একটি গ্রামের নাম-করঞ্জী ও অন্যটি—ধাওয়াইল। ১ গ্রাম দুটি যথাক্রমে পশ্চিম দিনাজপুর জেলার কুশমণ্ডী থানা ও মালদহের গাজোল থানার অন্তর্ভুক্ত। তবে জনশ্রুতিতে অনুমিত হয় যে, যাত্রাডাঙ্গী ২ নামে আরো একটি গ্রামে এই ব্রত এক সময়ে প্রচলিত ছিল। সরেজমিনে ক্ষেত্র অভিজ্ঞতায় জেনেছি যাত্রাডাঙ্গি বা যাত্রাডাঙ্গা মালদহ জেলার পুরনো মালদহ থানার অন্তর্গত। এখন সে গ্রাম মুসলমান প্রধান। কিন্তু একসময়ে সেখানে 'পাল' পদবীধারী কয়েক ঘর মানুষের বাস ছিল বলে বর্তমান বাসিন্দারা জানান। এরচেয়ে আর বেশী কিছু তথ্য তারা দিতে পারেননি। সুতরাং এই আলোচনায় যাত্রাডাঙ্গা গ্রাম-প্রসঙ্গ জনশ্রুতি নির্ভর মাত্র। কিন্তু করঞ্জী ও ধাওয়াইল গ্রামের অনুষ্ঠান

সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্য আমার জানা। বিশেষতঃ করঞ্জী ও ধাওয়াইল গ্রামের অনুষ্ঠান আমার নিজের চোখে দেখা।

এই ব্রত অনুষ্ঠানের তিথি প্রতি বৎসর মাঘ মাসে শুক্লা ত্রয়োদশী থেকে পূর্ণিমা পর্যন্ত। এই ক'দিন গ্রামে আমিষ নিষিদ্ধ। ব্রতীগণ উপবাসী। করঞ্জী গ্রামে বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে ভক্তিয়ার দুজন এই কদিন একবিন্দু জলপানের অধিকারী নন। শুধু তাই নয়, তাঁদের মলমূত্র ত্যাগও নিষিদ্ধ।

করঞ্জী ও ধাওয়াইল—এই দুই গ্রামেই এই ব্রত সম্পর্কে নানা কিংবদন্তীও রয়েছে। তদনুসারে গ্রামবাসীদের কাছে এই ব্রতের নাম 'কংসব্রত' বা 'কংস বধের ব্রত'। করঞ্জী গ্রামে লোকমুখে প্রচলিত যে, পুরাকালে শক্তিভক্ত রাজা কংস এই ব্রত চালু করেন। লোকমুখে আরও প্রচলিত যে, এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণের সুদর্শন চক্রের আঘাতে কংসের দেহ ত্রিখণ্ডিত হয়। এবং এই ত্রিখণ্ডিত দেহ তিনস্থানে গিয়ে পড়ে। অনুরূপ কথা ধাওয়াইল গ্রামেও শোনা যায়। সেখানে তো এই প্রসঙ্গে একটি ছড়া খুবই চালু—'মুণ্ডুখান পড়িল্ করঞ্জী, ধড়খান পড়িল্ ধাওয়াইল আর পাওখান পডিল্ যাত্রাডাঙ্গি'।৪ অথচ আমি শুক্লা ত্রয়োদশী থেকে মাঘী পূর্ণিমা পর্যন্ত করঞ্জী গ্রামে যে অনুষ্ঠান দেখেছি ও যে ব্রতগান টেপে ধরে রেখেছি তাতে এই প্রচলিত কিংবদন্তীর কোন সূত্র বা নিদর্শন প্রত্যক্ষতঃ মেলেনি। বরং আমার ধারণা এই ব্রত আসলে কর্ষব্রত তথা কৃষি উৎসবের একটি বিশেষ রূপ মাত্র। সাধারণ গ্রামবাসীর মুখে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে তাই কাস-ব রূপে উচ্চারিত ও প্রচলিত।৫

আচার্য ডঃ সুনীতিকমার চট্টোপাধ্যায় এই প্রসঙ্গে সংগৃহীত তথ্যাদি দেখে ও টেপরেকর্ডে গৃহীত ব্রতগান শুনে আমার ধারণার পক্ষে রায় দিয়েছিলেন।৬ তথাপি পশ্চিম দিনাজপুর জেলার বাঘনগ্রাম নিবাসী সর্বোদয়-ব্রতী শ্রীপবিত্র দে এই ব্রতকে বাংলার ইতিহাসের বিশিষ্ট হিন্দু রাজা গণেশের সঙ্গে যুক্ত করায় আমাকে এই ব্রতের ঐতিহাসিক সূত্রের সন্ধানে তৎপর হতে হয়। বিশেষতঃ তাঁতি গণেশ, কংস ব্রত, মাত্র তিনটি গ্রামে এই ব্রত উদযাপনের রহস্য ইত্যাদি বিষয়গুলিও আমার মনে খটকা বাঁধায়।

ব্রত উপলক্ষে করঞ্জী গ্রামে গিয়েই বুঝেছি, স্থান হিসাবে এর প্রাচীনতা সন্দেহাতীত। অধ্যাপক সরসীকুমার সরস্বতী, এইচ ই স্টেপেলটন-এর

প্রতিবেদনেও ৭ তা উল্লিখিত। (অথচ জেলা গেজেটিয়ারে এর উল্লেখ মাত্র নেই)। এই গ্রামের পুব দিকে মাইল দেড়েক দুর দিয়ে বয়ে গেছে টাঙ্গন নদী এবং উত্তর পশ্চিম দিকে মাইল দুয়েক দুর দিয়ে ক্ষীণস্রোতা শ্রীমতী নদী (ছিরামতী) প্রবাহিত। একদা এখানে যে কোন রাজপ্রাসাদ ছিল তার কিছু নিদর্শন এখনো রয়েছে। এই রাজপ্রাসাদ ঘিরে যে তৈরী হয়েছিল কোন পরিখা, তাও চেষ্টা করলে বোঝা যায়।

মুসলমান পাড়া পেরিয়ে একটি নীচু জমিতে নেমে সোজা উত্তরমুখে গেলে একটি উঁচু ঢিপি নজরে আসে। এর নাম ভীম-দেউল ঢিপি। ভীমদেউলের মাথায় এখনও একটি উঁচু বড় আকারের পাথর প্রোথিত। মনে হয় এটি কোন খিলানের ধ্বংসাবশেষ। এখান থেকেই আরো দুটি ঢিপি দেখা যায়। একটির নাম কিচিন অন্যটির নাম রান।৮ ভীমদেউলের নীচেই ব্রতের আহুতি জাগানো স্থান বা যজ্ঞস্থল। তারই কয়েক হাত দূরে একটি সুউচ্চ তেঁতুল গাছ। পথপ্রদর্শক গ্রামবাসী জানালেন যে, মাঘী পূর্ণিমার দিন যজ্ঞের আগুনে আহুতি দিলে যে হলকা ওঠে তা যদি তেঁতুল গাছের মাথা ছাড়িয়ে যায়, তবে বুঝতে হবে দেশের সুদিন আসন্ন।

ঢিপিগুলির মাঝে দেখা যায় ছোট ছোট প্রাচীন ইঁটের তৈয়ারী কূপ। বস্তুতঃ এখন এটি কূপের চিহ্ন মাত্র। এই কূপের সিকি মাইলের মধ্যে একটি পাড়া দেখা যায়, তার নাম গণেশ পাড়া।৯ এই গণেশ পাড়ার পশ্চিমে একটি প্রায় ভগ্নস্তূপে পরিণত জঙ্গলাকীর্ণ মন্দিরটির নাম ছাচিকা থান। এটি প্রাচীন ইঁট ও পাথর দিয়ে তৈয়ারী। দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে প্রায় ১৪ হাত এবং উচ্চতায় প্রায় ১৫ হাত। দেখলেই বোঝা যায় মন্দিরের অনেকখানি, অংশ মাটিতে বসে গেছে। দক্ষিণমুখী মন্দিরটির একটি মাত্র দরজা। শোনা যায়, এই মন্দিরের সামনের বারান্দায় অনেকগুলো দেবদেবীর মূর্তি ছিলো। দুটি বিষ্ণু মূর্তি (একটি চতুর্ভুজ, অন্যটি দ্বিভুজ যার ডানদিকে লক্ষ্মী ও বাঁ দিকে সরস্বতী শোভা পেত)। পাশে ছিল পাথরের গৌরী-পট্টহীন শিবলিঙ্গ। মন্দিরের মধ্যে ছিল ছাচিকা মাতার মূর্তি ও তাঁর পাশে বিষ্ণুমূর্তি। তাছাড়া চতুর্ভুজ শিবমূর্তি এবং অজ্ঞাত পরিচয় আরো কিছু মূর্তি।১০

সারা বছর প্রতি মঙ্গলবার ছাচিকা দেবীর পুজো হয় আর মাঘী পূর্ণিমার দিন তাঁর পুজো হয় বিশেষভাবে। এখন মন্দিরে দেবীমূর্তি নেই, আছে এক

ভাঙ্গা বিষ্ণু মূর্তি।

ছাচিকা দেবী সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট কিছু জানা যায় না। শুধু পাওয়া যায় দুটি মন্ত্র। ১১ গ্রামবাসীরা তাঁকে 'ঘরপুড়ী দেবী' বলে মানেন। তাঁদের বিশ্বাস এই দেবী রুষ্ট হলে গ্রাম আগুনে পুড়ে যায়।

প্রতি মঙ্গলবার বারেক-অভিহিত একজন তাঁতি গণেশ এই দেবী মন্দিরের মূর্তি স্নান ও মন্দির মার্জনায় নিয়োজিত থাকেন। এই কাজের জন্য বর্তমান বারেক পুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত সাড়ে চারবিঘা জমি ভোগ করেন। একদা এই ভোগ দখল ছিল নিষ্কর। কিন্তু এখন সে জমি নিজ নামে রেকর্ড হয়ে যাওয়ায় 'বারেক' খাজনা দিয়েই ভোগ করেন।

ছাচিকা দেবীর পুজো করেন মুগঋষি গোত্রের 'দাস' পদবীধারী একজন ব্যক্তি। ১২ তাঁকে বলা হয় মালাকার। তিনি এজন্যে পুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত সাড়ে চার বিঘা জমি ভোগ করেন। এই মালাকারের বাস গণেশ পাড়ার বাইরে।

এই গ্রামে সমগ্র ব্রত অনুষ্ঠানটিতে সরাসরিভাবে নয় ব্যক্তি যুক্ত। দুজন ভক্তিয়ার (তাঁতি গণেশ—বর্তমান পদবী 'বসাক'), একজন নিশানিয়া (তাঁতি গণেশ—বর্তমান পদবী 'বসাক'), একজন বারেক (তাঁতি গণেশ—বর্তমান পদবী 'বসাক') দুইজন প্রসাদিয়া (বৎসরান্তর একজনের দায়িত্ব—এরাও তাঁতি গণেশ—বর্তমান পদবী 'বসাক'), একজন মণ্ডল (তাঁতি গণেশ বর্তমান পদবী 'বসাক') ও একজন সর্ষেতেলের সরবরাহক (মুসলমান)। এছাড়া আছেন একজন মালাকার (ইনি তাঁতি গণেশ নন—পদবী 'দাস')।

ভক্তিয়ারের কাজ ব্রতগান ও নাচ। নিশানিয়া ব্রতোপলক্ষে একটি পাঁচ হাতি কাঁচা বাঁশ লাল ও সাদা কাপড় মুড়িয়ে তার মাথায় ময়ূরের পাখা বেঁধে শোভাযাত্রার পুরোভাগে অংশ গ্রহণ করেন। প্রসাদিয়ার দায়িত্ব আতপ চাল, কলা, দুধ, চিনি, বাতাসা দিয়ে নৈবেদ্য সাজিয়ে বারেকের মাধ্যমে পুজো মণ্ডপে পৌঁছে দেওয়া। মালাকার সারা বছর প্রতি মঙ্গলবারের পুজো ছাড়াও এই ব্রতে প্রয়োজনীয় দায়িত্ব পালন করেন। তেল সরবরাহক ৫ সের সরষের তেল আহুতির উদ্দেশ্যে দেন। আর 'মণ্ডল' এই ব্রতে প্রয়োজনীয় জ্বালানী (বাঁশ, কাঠ ইত্যাদি), ৩ জোড়া কবুতরের বাচ্চা, ৫ ঝুঁকি কলা, ঢাকুন, ধুপধুছচি, প্রদীপ, হাঁড়ি, পাতিল প্রভৃতি দিয়ে থাকেন। বাদ্যকরের মজুরী তাঁকেই দিতে হয়। বস্তুতঃ এই পুজো ও ব্রতের মূল দায়িত্ব এখন মণ্ডলের।

এসব কাজের জন্য সকলেই কিছু কিছু নিষ্কর জমি পুরুষানুক্রমে ভোগ করে আসছিলেন। দুজনের কথা পূর্বেই উল্লিখিত। আমি এঁদের দলিল দেখে জেনেছি যে এদের অব্যবহিত পূর্বপুরুষেরা ছিলেন চূড়ামন এস্টেটের রায়-চৌধুরীদের প্রজা। এবং এই করঞ্জী ও তার ব্রতানুষ্ঠান এই জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত ছিল।

এখানে ব্রতগান ও পূজা তিনভাগে বিভক্ত। একভাগ শুক্লা ত্রয়োদশী রাতে ভীম-দেউলের পাদদেশে আহুতি জাগানো থান বা যজ্ঞস্থলে অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় ভাগ শুক্লা-চতুর্দশীর রাতে সা-পুকুরের পাড়ে বর্ম বা ব্রহ্মাপুজোর স্থানে। তৃতীয় ভাগের আবার দুটি অংশ। প্রথম অংশ মাঘী পূর্ণিমার দিনে দুপুরে ছাচিকা দেবীর থানে ও অপর অংশ ঐদিন সন্ধ্যার পূর্বে আহুতি জাগানো স্থলে পালিত হয়।

ব্রতগানের অবশ্য ছাচিকা দেবীর স্থানেই সমাপ্তি ঘটে। ভক্তিয়াররা তারপর সা-পুকুরে গিয়ে স্নানাদির পর ব্রত সাঙ্গ করেন।

শুক্লা ত্রয়োদশীর রাতে ভীমদেউলের পাদদেশে আহুতি জাগানো পদ্ধতিটি এই রকম: ঐদিন দুপুরে যজ্ঞস্থলে মাটি খুঁড়ে মাঠ থেকে শুকনো গোবর এবং খড়ি কুড়িয়ে এনে জড়ো করা হয়। রাতে সেখানে ব্রতগান ও নাচ করার পর ভক্তিয়ার গর্তের মধ্যে রক্ষিত শুকনো গোবর ও খড়িতে আগুন জ্বালান। সে আগুন একটি খড়ের আঁটিতে দেওয়া হয়। সমস্ত আগুনই পরে তুষ ও মাটি চাপা দিয়ে দুদিন রাখা থাকে। গ্রামবাসীদের বিশ্বাস শত ঝড়-জলেও এ আগুন নিভে যায় না। অন্য দুই স্থানে ব্রতের আগুন ঝড়জলে নিভে গেলেও করঞ্জীর আগুন নেভে না। কেন না, তাদের মতে করঞ্জীই হলো 'কাষ-ব'র মূল ও আদি স্থান।

আহুতি জাগানো স্থানের ব্রতগান ও নাচের সঙ্গে ঢাক ও মেহনা (এক-ধরনের সানাই) বাজে। গানটির আরম্ভ হলো এই রকম:

সর ভায়া হে রাম রাম হে ছিরি বাসুদেবে
স্বর্গে জানে ছিরি বাসুদেবে
পাতালে জানে বাসুকী নাগে
ইথলে হামরা করিম শুদ্ধ
ইথলে আছে গহকংকলে

পালা পালা তুই গহকংকলে
নাহি পালাব তোমারি বলে।
হামরা যাম গোসাঞি পুরী
গোসাঞি পুরীতে আনব এক কোদাই বাণে
এহ বাণে শ্লোক সিড়াই দিম
ছয় হানিয়ে ভস্ম করিম
জেনে শুনিলে বানরি নামে
দূর পালাইল গহকংকলে ॥

... ...

শ্রীরাম বাসুদেবের নাম স্মরণ করে থান শুদ্ধির কাজ শুরু হয়। থান শুদ্ধির কথা স্বর্গে বাসুদেব এবং পাতালে বাসুকি নাগ জানেন। থানে আছে মল (গহকংকলে) ঝিকট খাতরে (ভাঙ্গা হাঁড়ির টুকরো) এবং দুর্বাঘাস। এগুলি যথাক্রমে কোদাল (কোদাই) ঝাঁটা ও খুড়পি (কোলাই) দিয়ে পরিষ্কার করার কথা ব্রতগানে প্রথমে ব্যক্ত।

থান শুদ্ধির পর ওখানেই ভক্তিয়ার সুর পাল্টে গায়—

ওহে হে ধর ধর ভুইঞাদেব হাতের তামুক খাও।
ওহে তাহা হৈতে চাহি হামরা ওসতাল ধান।
ওহে এ কথা শুনিয়া ভুইঞাদেব না থাকিল রৈয়া।
ওহে মেলাভৈর ফালায় ষাট বাষেট কোশে ॥
ওহে কতেকদূর যাইতে কতেক দূর যায়।
ওহে কতক দূর যাইতে কতেক পন্থ পায় ॥
ওহে কতেক দূর যাইতে কন্তীমার নাগা পায়।
ওহে কুন্তীমাক দেখিয়া দিল দণ্ড পরণাম ॥
ওহে বসিবাক দিলরে উত্তম সিংহাসন
ওহে কুন্তীমায়ের সিংহাসন এশিরে বন্দিয়া ॥
ওহে বসিল ভুইঞাদেব নেপেটি পাড়িয়া।
ওহে কোথা হইতে আইলেন বাছা কোথা তোরা যাও ॥
ওহে তাহা হইতে চাহি হামরা ওসতাল ধান।
ওহে একঝাড় ওসতাল ধান্য দেবের বরে।

ওহে তাহা দিতে না পারেছে আমার পরাণে।
ওহে তপ্ত পৈলাতে যেমন দড়শালের তেল
ওহে সেই মতন ভুইঞাদেবের কর্দ জ্বলি গেল॥
ওহে ওসতাল ধানের তোল ভুইঞাদেব করিল গমন।
ওহে একঝাড ওসতাল ধামরি মারিল টান
ওহে একটানে ওথাঙিল ঝাড় ছয় সাত
ওহে ইলুয়া কোলাইয়া তখন ভুইঞা ভাড বান্ধে
ওহে ভাড নোঞিয়া তখন ভুইঞা ভা-ল যায়
ওহে কতেক দূর যাইতে কতেক দূর যায়
ওহে কতেক দূব যাইতে থলির নাগ্য পায়।
ওহে এতগুলা ওসতাল ধান কিবা করিস কাজ।
ওহে আরগোলা ওসতাল ধান ঠাঁইয়ে ঠাঁইয়ে থো।
ওহে আরগোলা ওসতাল ধান বাহুরাইয়া দিল।
ওহে সেইগোলা ওসতাল ধান পিরথিমি ঢাকিল॥

[**টীকা:** ওসতাল—একরকমের ধান, যা আজ সম্ভবত অপ্রচলিত। মেলাভৈর--দীর্ঘ-পদক্ষেপ। পৈলা—কড়াই। কর্দ—ক্রোধ। তোল— তরে। ওথাঙিল—উঠাইল। ইলুয়া কোলাইয়া—ইলুয়া ঘাস পাকিয়ে। থলি —স্থলি। বাহুরাইয়া—ছড়িয়ে-ছিটিয়ে। পিরথিমি—পৃথিবী]

এইভাবে ভক্তিয়ার তার দোহার সহযোগে গান গেয়ে চলেন। ওসতাল ধানের পর আসে চামপার মকচ (চাঁপা কলার মোচা)-এর কামনা। তাও অবশেষে পাওয়া যায় এবং ওহে সেগোলা চামপার মকচ পিরথিমি ছাইল বলেও জাননো হয়। তারপর গামার কাঠ, কুশকাটা বাঁশ, কোপিলা গাইয়ের গোময় (গোবর)-এর কথা আছে।

তারপর উত্তুরমার কাছে চাওয়া হয় সোনার শিকিয়া (দড়ি) গড়াইং (ভাঁড়) কোদাই ও পিডই। এ সবই উত্তুরমা গ্রাম কামারের কাছে থেকে তৈয়ারী করিয়ে নিয়ে আসেন।

এরপর ভুইঞাদের কুম্ভকারের কাছ থেকে তৈয়ারী করিয়ে আনেন মাটির ঢাকুন।

ওহে কেহ মাটি কাটে কেহ মাটি বাছে
কেহ মাটি নান্দিয়া পাকায়

ওহে কেহ মাটি চাকো চড়ায়।
ওহে একোচাকে গড়াইল একচাড়া ঢাকুন।
ওহে ধর্মের দোহাই দিয়া পোনিতে চড়াইল ॥
ওহে গড়িয়া পড়িয়া কুমার করলে নিশিপন
ওহে তাহা নৈয়া ভুইঞাদেব সত্বরে গমন ॥

শুক্লা চতুর্দশীর রাতে ভক্তিয়ারের কাঁধে গাহুল বাঁধা হয়। 'গাহুল' হল পাঁচটি ধানের থোপ। গাহুল বেঁধে ভক্তিয়ারদ্বয় দাঁড়ান নিশানধারী (নিশানিয়া)-র পেছনে। তারপর, মালাকার, বারেক, মণ্ডল প্রভৃতি ব্রতীগণ। সকলে মিলে শোভাযাত্রা করে বাজনার তালে তালে নৃত্য করতে করতে সা-পুকুরে এসে উপস্থিত হন। সা-পুকুরে ভক্তিয়ার ঘাট শুদ্ধর গান করেন—

বলকোটদানি ঘাটৎ ছানি
ই ঘাটে হামরা করিম শুদ্ধ
ই ঘাটে আছে ধাইধামনকাটি
পালা পালা তুই ধাই-ধামনকাটি
নাহি পালাব তোমারি বলে
হামরা যাম গোসাঞি-পুরী
গোসাঞি পুরীতে আনব এক কোদাই বাণে। ইত্যাদি।

[**টীকা** ঃ দিঘি বা পুষ্করিণী কাটানো বা পরিষ্কার করার দরকার পড়লে যাদের ডাকা হয়, তারাই এই অঞ্চলের ভাষায় 'বলকোটদানি'। ধাইধামন— কচুরীপানা। কোদাই—কোদাল।]

কচুরীপানা, মৎস্যমকর, ঝিনুক, শামুক, কুমীর ও নানা জলজ উদ্ভিদে ঘাট অশুদ্ধ তথা বিপজ্জনক। এসব পরিষ্কার করে ব্রহ্মপুত্র, গঙ্গা, পুনর্ভবা, তুলাই, টাঙ্গন, শ্রীমতী, বালিয়া প্রভৃতি নদীর জল এনে ঘাট ধুয়ে পবিত্র করে তোলার কথা গানে প্রকাশিত।

ঘাট-শুদ্ধ গানের পর মালাকার ব্রহ্মপুজো করেন। ঘাটের কাদামাটি দিয়ে ব্রহ্মের একটি ছোট বেদী তৈয়ারী করা হয়। তার দু'পাশে দুটি ছোট কাঠি (কঞ্চি) পুঁতে তার উপর দুটি শোলার কদমফুল ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। এরপর দুটি হাঁসের ডিম ঐ কঞ্চির কাঠির উপর ভেঙ্গে আটকে দেওয়াই রীতি। দুটি ছোট ছোট শঙ্খের উপর কলা ও আতপ চাল রেখে পুজো করা এই থানের

বৈশিষ্ট্য। সেখানকার পুজো সেরে হাটখোলা থানে দেউলানী কালীর পুজো দিতে যাওয়া হয়। এরপর সকলে ফিরে যায় যে যার বাড়ীতে। শুধু ভক্তিয়ার দুজন সে-রাত কাটান ছাচিকা দেবী থানে।

পরের দিন মাঘী পূর্ণিমা। হাটখোলা থানে বসে মেলা। সকাল থেকে আশপাশের গাঁয়ের থেকে লোকজন ছুটে আসেন ব্রত আর মেলা দেখতে। সেদিন করঞ্জীর গণেশ পাড়া লোকারণ্য।

দুপুরেই ছাচিকা দেবীর থানে পূজোর বাজনা আর মেহনা বেজে ওঠে। ভক্তিয়ারদ্বয়ের অবশিষ্ট ব্রতগান ও নাচের পালা হয় শুরু। এই তিনদিনের কঠিন ব্রত পালনের ছাপ তখন তাঁদের চোখে মুখে স্পষ্ট। গানের কণ্ঠ ক্ষীণ, উচ্চারণ অস্পষ্ট।

এখানকার গানে আছে শণের চাষ করার আকাঙ্ক্ষা (ওহে তাহা হৈতে চাহি আমরা শণের ক্ষেতি)। ব্রত-কথায় আছে ভাই ভাতিজা গোসাইপুরীতে শণের ক্ষেতি করার কথা জানালে গোসাই শণের গুরুত্ব তাদের বোঝান। শণের বীজের সন্ধানে ভাই-ভাতিজা বর্মপুরী (ব্রহ্মাপুরী) হয়ে শিবের পুরীতে এসে উপস্থিত হন। ভাই-ভাতিজার প্রার্থনায় শিব বীজের ধামা এনে গোটা কয়েক উকুটিয়া বীজ দেন। তারপর ভাই-ভাতিজা শিবের কাছে শণ চাষের রীতি পদ্ধতি জেনে নিতে চান। শিব তখন বলেন,

> সোনার লাঙ্গল সোনার জুঙ্গাল জুড়াবেন রূপার ফাল।
> মামা ভাগিনা গোরু জুড়িবেন হাল॥
> বারো পাট চাষ দিবেন, তেরো পাট মই।
> তবু তো না মরে কেন্‌না দুব্বা নই॥

অতএব, কেন্‌না দুব্বা বাছিয়াক ফেলাবেন অনেক দূর। এই শণের বীজ বোনার আগে,

> আতপ চাইলে বাইঙ্গা দুধে সংযম খাবেন।
> তাহাক পোহালেক শণ বুনিবারে যাবেন।
> যখন বাড়িবেক শণ একেক পাতেসে।
> তখন আঘুরিবে শণ একো আদেশে॥
> যখন বাড়িবেক শণ দুই দুই পাত।

তখন আঘুন্নিবে শণ দুই আদেশে ॥
যখন বাড়িবে শণ তিন তিন পাতে।
তিরশাল কুড়িবর পাইয়া শণ হলফল বাড়ে ॥

ব্রতগান শেষ হলে মালাকারের ছাচিকা দেবীর পুজো আরম্ভ হয়। পুজোর মন্ত্রের একাংশ এইরকম—

আঙ্গটি মাঙ্গটি শিবের ঘরণী
বাদে যাও বাদে আইস
বাদে ঠাকুরানী
আমার হাতে লয় ফুলপানি।

[**টীকা**ঃ পুজোর মন্ত্র থেকে স্পষ্ট ছাচিকা—সতীকা। ইনি সম্ভবত মঙ্গলচণ্ডী। মূর্তি পরিচয় অজ্ঞাত। বাদে যাও বাদে আইস—কখনো যাও কখনো আস।]

পুজোর পর বাজনা ও মেহনা বাজানো হয় খুব দ্রুত লয়ে। মালাকার একটি হাঁড়িতে জলন্ত পাটকাঠির গোছা নিয়ে কোমরে একটি লাল কাপড় জড়িয়ে দ্রুতপায়ে পাঁচবার মন্দির প্রদক্ষিণ করেন। তারপর তার মধ্যে দেবীর ভর হয়। স্থানীয় ভাষায় এই হাঁড়িকে বলা হয়—সাঞ্চালের হাণ্ডি। ভর-পড়ার নাম—পাতাপড়া বা ঘোড়া নামা।

ভর মুক্ত হলে মালাকার-সহ সকলে যান ব্রতের শেষ কাজ ধর্মের আগুন জ্বালাতে আহুতি জাগানো থানে। ভক্তিয়ারদ্বয় তখন দেবীথান থেকে সোজা চলে যান সা-পুকুরে ব্রত সমাপন স্থানে। আহুতি জাগানো থান তখন ভীড়ে ভীড়। দুপুরের মধ্যেই সেখানে একটি বড় গর্ত খোঁড়া হয়ে আছে। ১৩ সেই গর্তের ঠিক মাঝখানে ঠিক চিতার মত করে তেঁতুল কাঠ ও বাঁশ সাজানো। এরই ফাঁকে মাঝখানে বালি ভর্তি একটি মাটির সরা এবং তার উপর একটি মাটির বড় হাঁড়ি বসানো। সে হাঁড়িতে তেল সরবরাহকের দেওয়া ৫ সের তেল ঢালে গ্রামেরই একজন নাউ (নাপিত)। আর সেই সঙ্গে হাঁড়িতে দেওয়া হয় পাশোসি বা পাঁচ শস্য (যেমন: পাট, ধান, সর্ষে, কলাই ও দুর্বা) সম্ভবত এই ৫ শস্য গ্রামীণ মানুষের কাছে গুরুত্বপূর্ণ।

এবার পাশের গর্ত থেকে ত্রয়োদশীর রাত্রে আগুন জ্বালানো খড়ের আঁটি শুকনো গোবর ও খড়ি তুলে নিয়ে এসে যজ্ঞস্থানে ধর্মের আগুন দেওয়া হয়। ধীরে ধীরে জ্বলে ওঠে আগুনের লেলিহান শিখা। তখন মালাকার তিন জোড়া

কবুতর বাচ্চার ঘাড় ছিঁড়ে রক্ত ছিটিয়ে দেয় আগুনের কুণ্ডে। ক্রমশ আগুনের তেজে হাঁড়ির সব তেল যায় পুড়ে। তারপর একটি লম্বা বাঁশের মাথায় বাঁধা ছোট ঘটি থেকে দুধ মধু মেশানো পবিত্র জল পাঁচবার পাঁচটি প্রশ্ন সহ হাঁড়িতে দেওয়া হয়। আর সঙ্গে সঙ্গে হাঁড়ি থেকে লাফ দিয়ে ওঠে একটি আগুনের হলকা। তখন উপস্থিত সকলে কাস-ব কাস-ব বলে সহর্ষে চেঁচিয়ে ওঠেন। এই আগুনের হলকা যত উঁচুতে ওঠে তদনুযায়ী মেলে প্রশ্নের জবাব। প্রশ্নগুলো এই রকম: ১। আগামী সনে পাটের ফলন কি রকম? ২। আগামী সনে ধানের ফলন কি রকম? ৩। আগামী সনে সর্ষের ফলন কি রকম? ইত্যাদি। ১৪

যদি এই সব প্রশ্নের সঙ্গে আগুনের হলকা খুব উঁচুতে ওঠে তবে তার উত্তর হল আগামী সনের ফলন ভালো। বিপরীত হলে খারাপ।

যজ্ঞের আগুন নিভে গেলে হাঁড়ি ও বালি ভর্তি মাটির সরা ঐ কুণ্ড থেকে তুলে আনা হয়। উত্তপ্ত মাটির সরাব গনগনে বালির উপর ছড়িয়ে দেওয়া হয় নানা শস্য। দেখা যায় এতে কোন শস্য যায় পুড়ে, কোন শস্য থাকে অক্ষত। যে শস্য পুড়ে যায় আগামী সনে তার অভাব হবে বলে গ্রামবাসীদের বিশ্বাস। হাঁড়ির নীচে সামান্য যে পোড়া তেল থাকে তা সংগ্রহ করার জন্য উপস্থিত সকলের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে যায়। এই তেল নাকি ঘা সারাবার মহৌষধ।

করঞ্জী গ্রামে তিনদিন ধরে যেভাবে ব্রত পালন করা হয় ধাওয়াইল-এর অনুষ্ঠান তার তুলনায় অনেক সংক্ষিপ্ত। সেখানে ছাচিকাদেবীর থান নেই, নেই কোন ঢিপি বা স্তূপ। ব্রতগানও সেখানে অপ্রচলিত। সেখানে যারা এই ব্রত পালন করেন তাঁদের পদবী পাল।

ধাওয়াইল গ্রামে আহুল মারা অনুষ্ঠানই প্রধান। করঞ্জী গ্রামের আহুতি জাগান বা ধর্মের আগুনের সঙ্গে এই অনুষ্ঠানের বিশেষ কোন পার্থক্য নেই।

এই গ্রামে একটি কংসের বেদী আছে। ১৫ কিন্তু তার সঙ্গে কাষ-ব অনুষ্ঠানের কোন যোগ পাওয়া কঠিন। একটি প্রতিবেদন ১৬ থেকে জানা যায় যে এই গ্রামে ত্রয়োদশীর দিন সন্ধ্যায় ঢাকঢোল বাজিয়ে নিকটস্থ পুকুরের জলে ডুব দিয়ে একটি কাষ্ঠখণ্ড তুলে আনা হয়। তারপর সেটিকে প্রচুর পরিমাণে তেল সিঁদুর মাখিয়ে ভক্তরা মাথায় নিয়ে সমস্ত গ্রাম প্রদক্ষিণ

করেন। (এও শোনা যায় যে, অনুরূপ অনুষ্ঠান করঞ্জীতে এক সময় প্রচ
ছিল। বস্তুতঃ আমি নিজে ওই গ্রামে গিয়ে এই তথ্যের কোন সূত্র পাইনি।

অধ্যাপক মিহিররঞ্জন লাহিড়ি যে অভিজ্ঞতা ১৭ বর্ণনা করেছেন তাতেও এই তথ্যটি অনুপস্থিত। তাঁর বিবরণীতে আছে মাঘী পূর্ণিমার সন্ধ্যায় প্রায় তিন ফুট লম্বা একখণ্ড চৌকো মসৃণ তেল-সিঁদুরচর্চিত খোদিত শালকাঠ ১৮ যার উপর গোটা তিনেক ত্রিশূল লাগানো তা পাটকালীর মূর্তিরূপে গ্রামবাসীদের কাছে পূজিত হয়। আহল মারা হল চারপাশের কর্ষিত জমির মাঝখানে অকর্ষিত একখণ্ড জমি। (এই জমি কখনোই কর্ষিত হয়নি বলে গ্রামবাসীদের দাবী) সেই জমিতে এই পাটকালীর পূজো হয়। পূজান্তে পাটকালী তাঁর থানে ফিরে যান। তাঁর থান হল একজন গৃহস্থের বাড়ীর বারান্দার উঁচুতে ঝোলান একটি তাক।

সুতরাং এ থেকে বোঝা যায়, যে পুষ্করিণী থেকে কাষ্ঠখণ্ড তোলার পুরানো নিয়ম এখন উঠে গেছে। তাছাড়া ধাওয়াইলের অনুষ্ঠানে ইদানিং বহু শিক্ষিত ব্যক্তি অংশগ্রহণ করায় প্রাচীন প্রথার অনেকটাই ক্রমশঃ বিনষ্ট হয়ে পড়েছে। করঞ্জীতেও এই অনুষ্ঠানের অনেক অংশ ক্রমশঃ লোপ পেতে শুরু করেছে। সম্ভবত এখন সেখানে আর ব্রতগান চালু নেই।

এপর্যন্ত এ ব্রতের যে পরিচয় পাওয়া গেল, বোধকরি তা থেকে স্পষ্ট যে এটি কর্ষব্রত। ফলতঃ কাষ-ব কর্ষব্রত-এর অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত প্রাকৃতরূপ। গ্রামগুলিতে প্রচলিত যে ব্রতটি প্রায় চার-পাঁচশ, বছরের পুরানো। ব্রতের পদ্ধতি ও ব্রতগানের ভাষায় একে অর্বাচীন বলা চলে না কোন মতেই। এর মধ্যস্থিত বহুশব্দের সঙ্গে আদি-মধ্য বাংলার স্বারূপ্য মেলে।* এমন বহু শব্দ আছে যার অর্থ উদ্ধার করা এখনো সম্ভব হয়নি। যে বৃদ্ধ ভক্তিয়ারের কাছ থেকে এই গান আমি শুনেছি, তিনি নিজেও বলতে পারেন না এর অনেক শব্দের অর্থ বা পরিচয়। পুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত এই গান তাঁর স্মৃতিতে রক্ষিত। তাঁর জ্যেঠামশাই মারা যাবার পর এ গান সেই করে থাকে। তবে তাঁর বয়সের সঙ্গে সঙ্গে স্মৃতিভ্রংশ ঘটেছে। ফলে ব্রতগানের কিছু অংশ লুপ্ত হয়ে গেছে বলে মনে হয়। এই ভক্তিয়ারই হচ্ছে সম্ভবত এর শেষ গায়ক। কেননা, এই ব্রতগান করা ও শেখার জন্য যে নিষ্ঠা, সংযম ও আগ্রহ আবশ্যক তা একালের গণেশপাড়ায় কারো মধ্যে নেই বলেই বৃদ্ধ ভক্তিয়ারের ধারণা।

এ ব্রত যাত্রাডাঙ্গিতে যেভাবে লুপ্ত হয়ে গেছে ধাওয়াইলে যেভাবে একটি সংক্ষিপ্ত ও প্রক্ষিপ্তরূপে এসে দাঁড়িয়েছে ঠিক সেভাবেই এই ব্রত ক্রমশঃ অবলুপ্তির পথে এগিয়ে চলেছে করঞ্জীতেও।

ব্রতকথা বা ব্রতগানের পরিবেশন ভঙ্গিটিও বৈশিষ্ট্যদ্যোতক। সংগৃহীত সমস্ত ব্রতগানটি দিতে পারলে পাঠক হয়ত ভালোভাবে ধারণা করতে পারতেন। তবে উল্লিখিত অংশগুলি থেকেও পাঠকের মোটামুটি একটা ধারণা বোধকরি হতে পারে। ভক্তিয়ার প্রথমে ব্রতকথার একটি পদ সুরসহযোগে বলেন। পরে দুজন দোহার ওই পদটি ভক্তিয়ারের সুরে গেয়ে ওঠেন। পদগুলি প্রায়শই পুনরুক্ত। অতি সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ্য করলে দেখা যায় ব্রতগানে ক্রমশই একটি করে নতুন শব্দ ও পদ যুক্ত হচ্ছে। এই ব্রতের আদি গায়েন কী আশ্চর্য কৌশলে উপস্থিত শ্রোতাদের মধ্যে যোগ্য শিষ্যের স্মৃতিতে এই ব্রত ধরে রাখার শিক্ষা দিয়েছিলেন। বেদ-বঞ্চিত এইসব একলব্যরা পুরুষানুক্রমে এইভাবে বহু বছর ধরে এই ব্রতকথা স্মৃতিতে রক্ষা করায় সচেষ্ট।

পশ্চিম দিনাজপুর ও মালদহ জেলার যুক্ত মানচিত্রে লক্ষ্য করা যায়, এই ব্রত পালনের জন্য নির্দিষ্ট তিনটি গ্রাম উত্তর-পূর্ব থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমমুখী টানা একটি সরলরেখার উপর অবস্থিত। এবং এই তিনটি গ্রামই একটি অপরটির থেকে সম পরিমাণ দূরত্বে চিহ্নিত। শুধু তাই নয় ইতিহাস বিখ্যাত বৈরহাট্টা করঞ্জী ও ধাওয়াইল গ্রামের ঠিক মধ্যবর্তী একডালা অংশ অবস্থিত। ইলিয়াসশাহী রাজবংশের রাজধানী পাণ্ডুয়া থেকে যাত্রাডাঙ্গা গ্রামও দূরে নয়। প্রসঙ্গত স্মরণীয় যে, করঞ্জীর নিকটবর্তী টাঙ্গন নদী দক্ষিণে যাত্রাডাঙ্গার পাশ দিয়ে বয়ে গেছে।

তদুপরি একটি প্রশ্ন প্রায়শ মনের মধ্যে উঁকিঝুঁকি দেয়। কাষ-ব যদি নিতান্তই একটি কৃষি-উৎসব বা লৌকিক-ব্রত হয়ে থাকে তবে তা কেন মাত্র নির্দিষ্ট তিনটি গ্রামেই সীমাবদ্ধ। এবং এই ব্রত করঞ্জী গ্রামে তাঁতি গণেশ, ধাওয়াইলে ও যাত্রাডাঙ্গায় পাল বা কুম্ভকার দ্বারা পালিত। এবং এই নির্দিষ্ট তিনটি গ্রামের বাইরে বসবাসকারী গণেশ ও কুম্ভকারগণ বলাই বাহুল্য এই ব্রত পালনের অধিকারী নন। তাঁদের অধিকাংশই এ ব্রতের কথা জানেন না। তখনই কিছু সঙ্গত কারণে রাজা গণেশ প্রসঙ্গ এসে পড়ে। কেননা এই করঞ্জী একদা ছিল তাঁর বাসস্থান ১৯। এবং সম্ভবত এই ব্রতের প্রবর্তক ছিলেন তিনি। প্রচলিত কিংবদন্তী ও ঐতিহাসিক সূত্রগুলি মেলালে দেখা

যায় এই ব্রত প্রবর্তনের পশ্চাতে তাঁর একটি গুরুতর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সম্ভবত কাজ করে থাকবে।

বিভিন্ন ঐতিহাসিক নিদর্শনসূত্রে জানা যায়, যে বাংলা ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রায় একটানা মুসলমান শাসনের অধীন, তার মধ্যে আকস্মিকভাবে একজন হিন্দুর পক্ষে কয়েক বছরের জন্য হলেও সমগ্র বাংলায় সিংহাসন অধিকার করাটা যথার্থই বিস্ময়ের বিষয়।

ইতিহাসে কোন ঘটনাই আকস্মিক ঘটে না। রাজশক্তি অর্জন কোন দৈব ঘটনা দ্বাবা চালিত হয় না। রাজা গণেশ দীর্ঘদিন ধরে ইলিয়াসশাহী বাজবংশের একজন প্রভাবশালী হিন্দু অমাত্য যে ছিলেন তা ইতিহাস-বিদিত। তাঁর বংশ এবং তিনিই স্বয়ং বাজশাহীর ভাতুরিয়া পরগণার জমিদার হলেও পববর্তীকালে পাণ্ডুয়ায় ইলিয়াসশাহী রাজবংশেব অমাত্য থাকাকালীন কবঞ্জীতে তাঁব পক্ষে একটি জমিদারী নির্মাণ করা অস্বাভাবিক নয়।

তিনি যে অত্যন্ত ব্যক্তিত্বশালী প্রখর বুদ্ধিমান, কূটনীতিজ্ঞ ও দূরদর্শী মানুষ ছিলেন তাব উল্লেখ ইতিহাসে বয়েছে।২০ ফলে অমাত্য থাকাকালীনই সামরিক শক্তির উপব তাঁর প্রভাব ছিল অপরিসীম। শুধু তাই নয়। ইতিহাস বলে, সুলতানী আমলেই তিনি নিজেই সামরিকবাহিনী সংগঠিত করেন। ঐতিহাসিক সূত্র থেকে এ-কথাও জানা যায় যে, সুলতানের দরবারে তাঁর প্রভাব ক্রমশ বৃদ্ধি হওয়াব দরুন তিনি ধীরে ধীরে তাঁর জমিদারী দক্ষিণাভিমুখী একডালা বৈরহাট্টা পর্যন্ত বাড়িয়েছিলেন এবং সেখানে তাঁর ছেলে মহেন্দ্রকে ২১ অধিপতি হিসাবে নিযুক্ত করেন। ২২

ইলিয়াসশাহী বংশের এই ক্ষমতাবান অমাত্য ও 'একান্ত মিত্র সেবককে' সুলতান গিয়াসুদ্দিন আজমশাহ ধর্মান্ধতার বশবর্তী হয়ে পদচ্যুত করেন। ফলে এই মিত্র সেবকই ইলিয়াসশাহী বংশের উচ্ছেদকল্পে নানা গোপন পন্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। বোধকরি, এই ব্রত তারই একটি ছদ্ম অঙ্গ।

করঞ্জী ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চল যে দশম থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত হিন্দু রাজবংশ ও হিন্দু ধর্মের অধীনস্থ ছিল তা এই অঞ্চলে প্রাপ্ত মূর্তিগুলি থেকে প্রতীয়মান হয়। পশ্চিম দিনাজপুর জেলার ভাষা ও সংস্কৃতিতে এখনো যাদের প্রাধান্য রয়েছে তারা দেশী ও পলি (দেশীয়া বা পলিয়া) বলে পরিচিত। করঞ্জী গ্রাম থেকে ত্রিবিক্রম বিষ্ণুর যে মূর্তি পাওয়া যায় তার শিলালিপিতে

২৩ উল্লেখিত পলেরয়ং ঠক্কুরঃ বা পলিদের ঠাকুর। ২৪ এ থেকে বোঝা যায়, সেই প্রাচীনকাল থেকেই-এ অঞ্চলে পলিয়াদের বেশ প্রাধান্য আছে। রাজা গণেশ সম্ভবত তাদেরই তাঁর পাইক ও সামরিক বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করেন। ২৫ আমি বর্তমান ব্রতীদের চেহারার কারো কারো মধ্যে কিছু কিছু পলিয়া জাতির ছাপ দেখেছি। আমার ধারণা পলিয়াদের মধ্যে যারা রাজা গণেশের পাইক ও সামরিক বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, তাঁরাই গণেশ সম্প্রদায় বলে পরিচিত। এ বিষয়ে গবেষণার যথেষ্ট অবকাশ আছে।

করঞ্জী গ্রামের গণেশপাড়ার এক মাইল দূরে যে হাট আছে তার নাম আগদুয়ার, সম্ভবত সেটি ছিল রাজপ্রাসাদের অগ্রবর্তী দ্বার। আর গণেশপাড়ার ভেতরেই ছিল পাছদুয়ার হাট। সেটি হয়ত পশ্চাদবর্তীদ্বার। উল্লিখিত ঢিপিগুলি প্রাসাদ মন্দির ইত্যাদির ধ্বংসাবশেষ মাত্র। প্রাসঙ্গিক যে কিংবদন্তীটি আছে তাও রাজপ্রাসাদেরই সাক্ষ্য দেয়।

ছাচিকাদেবীর মন্দির ও তার ভাস্কর্য দেখে মনে হয় এই কীর্তি স্বয়ং রাজা গণেশের। তিনি চণ্ডীর উপাস্য ছিলেন একথা ইতিহাস-বিদিত। ছাচিকা-দেবী হয়তো সতীকা দেবী যিনি প্রতি মঙ্গলবার আজও নিয়মিত পূজো পেয়ে আসছেন।

সমগ্র ব্রতানুষ্ঠানের মধ্যে বহু লৌকিক ধর্মবিশ্বাস মত ও রীতিনীতি যুক্ত থাকলেও এক জন নিষ্ঠাবান হিন্দু ব্রাহ্মণই যে এর প্রবর্তক তার নিদর্শন মেলে। কিংবদন্তীতেও এর সংকেত পাওয়া যায়। হিন্দু ধর্মের প্রভাবের ফলে হিন্দু পুরাণের উল্লিখিত কংসের কাহিনী এ অঞ্চলে সকল মানুষের মধ্যেই সুবিদিত। ধাওয়াইল গ্রামে একটি ভগ্ন নারায়ণ মূর্তিকে কংসরূপে পূজো করতে দেখেছি। তা কি অনেকটা অলক্ষ্মীর পূজোর মত? তাছাড়া প্রচলিত লোকবিশ্বাসকে কংসবধের ব্রতরূপে পালনের নির্দেশ দিয়ে রাজা কি তাঁর পাইক-ব্রতীগণ ও অন্যান্য হিন্দু প্রজাদের শত্রু নিধনে উৎসাহিত করেছিলেন? কেননা ব্রতীরা সকলেই এই ব্রত পালনের জন্য নিষ্কর জমি ভোগ করতেন। এই ব্রতে বহু লৌকিক শাস্ত্রীয় পূজাবিধি লক্ষণীয়। অনেক সময় রাজ-নির্দেশে প্রবর্তিত শাস্ত্রীয় আচার অনুষ্ঠান সেই রাজার পতনের ফলে ধীরে ধীরে লৌকিক আচার অনুষ্ঠানে রূপান্তরিত হয়ে যায়। (অথবা লৌকিক কর্মব্রতের সঙ্গে কঠিন কঠোর শাস্ত্রীয় আচার অনুষ্ঠান যুক্ত হয়ে একটি ঐতিহাসিক রাজনৈতিক

ঘটনা সাধিত করেছে। আবার সেই ঘটনার অভাবে ধীরে ধীরে সে শুধুমাত্র লৌকিক আচারে ফের পরিণত হয়ে গিয়েছে।) অর্থাৎ লৌকিকব্রত থেকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত শাস্ত্রীয় আচারযুক্ত ব্রত এবং ফের লৌকিক ব্রত। আলোচিত ব্রতে তার প্রচুর নিদর্শন মেলে।

উল্লিখিত জনশ্রুতি থেকে বোঝা যায়, করঞ্জী হল এই ব্রতের মস্তিষ্ক এবং একডালা বৈরহাট্টার নিকটবর্তী ধাওয়াইল হয়ে পাণ্ডুয়ার সন্নিকটস্থ যাত্রাভাঙ্গি পর্যন্ত তা প্রসারিত। এরমধ্যে হয়তো লুকিয়ে আছে রাজা গণেশের কোন রণকৌশল। সম্ভবত এই ব্রতের ছদ্ম-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাঁর সামরিক বাহিনী দিয়ে তিনি ধীরে ধীরে পাণ্ডুয়া ঘিরে ধরেছিলেন। ইতিহাসে তো উল্লিখিত যে গিয়াসুদ্দিন আজমশাহকে তিনি ষড়যন্ত্র করে হত্যা করেন। এবং তার দু বছরের মধ্যে তিনি ধীরে ধীরে বকলমে রাজা হয়ে বসেন।

প্রসঙ্গত লক্ষণীয় যে, এই ব্রতে একজন মুসলমানও অংশী। এটি যদি অর্বাচীন কালের প্রক্ষিপ্ত ব্যাপার না হয় তবে ধরে নিতে হবে গণেশ তাঁর জমিদারী অংশের মুসলমানদের উপরও প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিলেন। এবং গিয়াসুদ্দিন উচ্ছেদে তিনি হয়তো তাদের কিছু অংশকে সুকৌশলে কাজে লাগিয়েছিলেন।

এই ব্রতে যে কঠিন সংযম ও নিষ্ঠার সাধনা, পৌরাণিক বিশ্বাস পরিলক্ষিত তা থেকে অনুমতি হয় রাজা গণেশ কিভাবে শত্রু হত্যায় তাঁর বাহিনীকে অনুপ্রাণিত করে তুলেছিলেন। আহুতি থানের হাঁড়ি থেকে যে হলকা ওঠে তার মাধ্যমে তিনি হয়তো কোনো গোপন সংকেত রচনা করতেন। অথবা এটা হয়তো যুদ্ধ-বিজয়ের উল্লাস প্রকাশের একটি রূপ মাত্র। আজও পশ্চিম দিনাজপুর জেলার গ্রামে গ্রামে উৎসব উপলক্ষে বিশেষত নবান্নে মাংস কাটার পর একটি মাটির হাঁড়িতে ঐ মাংসের চর্বি পুড়িয়ে জল ঢেলে হলকা তোলা হয়। তখন গ্রামের আবালবৃদ্ধবণিতা আনন্দে কাস-ব ধ্বনিতে ফেটে পড়ে। করঞ্জী গ্রামে আহুতি জাগানোর থানে মাটি চাপা আগুন সম্পর্কে গ্রামবাসীদের প্রচলিত বিশ্বাস (ঝড় জলে যদি অন্য দুই স্থানের আগুন নিভে যায় তবে করঞ্জী থেকেই ব্রতীদের আগুন নিতে হয়) থেকে মনে করা যেতে পারে যে ইলিয়াস-শাহী সুলতানদের বিরুদ্ধে রাজা গণেশ যে ষড়যন্ত্র রচনা করেছিলেন তা মূলতঃ করঞ্জী থেকেই পরিচালিত হতো।

যোগ চিহ্নের মত মাটি খুঁড়ে হিন্দুদের চিতা সাজানোর পদ্ধতির মতো যজ্ঞকুণ্ডটি নির্মাণের মধ্যেও হয়তো গণেশের কোন রাজনৈতিক কৌশল লুক্কায়িত।

কংসব্রত—কংসরাজার থান, এই কিংবদন্তীগুলির মধ্যে কতখানি ঐতিহাসিক সত্য আছে জানি না, তবে সে সময়ে ও তারপরে মুসলমানদের কাছে গণেশ রাজা 'কাণস' নামে উল্লিখিত ছিলেন। পৌরাণিক কংস কাহিনী ও রাজা কানস কাহিনী এক্ষেত্রে একত্র সন্নিবেশিত হলেও খুব স্ববিরোধী বলে মনে হয় না। তবু মনে রাখতে হবে এব তিনটি সূত্র। এক, কর্ষণ থেকে কংস। দুই, পৌরাণিক কংসেব কাহিনী গণেশেব হিন্দু প্রজাদেব সুলতানেব প্রতি বৈরী মনোভাব সৃষ্টিতে সহায়তা। তৃতীয়তঃ মুসলমানদের কাছে রাজা গণেশ কানস বলে উল্লেখিত। কালে কালে এই সব বিষয় সাধাবণ গ্রামবাসীর ধারণায় মিলে মিশে গেছে যা আপাতভাবে স্ববিবোধী বলে মনে হতে পাবে। তবে লক্ষ্মণীয় যে এইরকম একটি ঘটনার খুব উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া কঠিন। এই অঞ্চলে প্রচলিত সৈতপীবেব মধ্যে এইচ, ই, স্টেপেলটন গণেশ কাহিনীর সামান্য ছায়াপাত দেখলেও অন্যান্য লোকগাথায় এর সন্ধান দুর্লক্ষ। প্রসঙ্গত সংক্ষেপে উল্লেখ কবা যেতে পাবে যে সংঘবদ্ধ ও পরিকল্পনা মাফিক ক্ষেত্র-গবেষণাব অভাবে এ অঞ্চল থেকে বহু পুঁথি এবং বহু মূর্তি আজ লুপ্ত।

সূত্র-পঞ্জী

* গণেশ জাতি প্রসঙ্গে হ্যামিলটন বুকানন: Canes, potmakers. Although on the authority of the Pandit I have placed among the tribes of Bengal. I am extremely doubtful concerning his accuracy. This tribe is confined to the northern parts of Dinaj poor, and the adjacent parts of this district which were not included in the Hindu Kingdom of Bengal, and I am apt to suspect that they are of one of the original tribes of Matsya Des. They may be about 50 houses.

Eastern India (Martin) Rangpoor, Page 531.

১। জে এল নং ১০৭, ১৭৩ যথাক্রমে পঃ দিনাজপুর ও মালদহ জেলা।

২। জে এল নং ৮৩, হালনা ৭৭ মালদহ জেলা।

৩। পশ্চিমবঙ্গের পূজা পার্বণ ও মেলা (প্রথম খণ্ড) সম্পাদক : অশোক মিত্র

৪। কংসব্রত একটি প্রাচীন অনুষ্ঠান :

৫। কর্ষণ,>কষণ>কন-স, কংস। মূল অর্থ ছাড়িয়ে পৌরাণিক কংস প্রাধান্য পেয়েছে।

৬। তাঁর নিজের হাতের লেখা পত্র লক্ষ্য করুন।

৭। J.P.A.S.B. (N.S) Vol. XXVIII (1932) & (1932)

৮। অনুরূপ বিবরণ পশ্চিমবঙ্গেব পূজা পার্বণ ও মেলা (১ম খণ্ডে) রয়েছে।

৯। '...that Ganos para (which is certainly an ancient site) H.E. Stapleton. J A.P.S.B, (N.S) Vol. XXVIII, 1932

১০। পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বণ ও মেলা (১ম খণ্ড) ১২৭ পৃঃ।

১১। একটি মন্ত্র : সিন্দুরের আসন, সিন্দুরের বসন সিন্দুরের সিংহাসন। এই সিন্দুর দিনু মা গারম কি, চণ্ডী কি বিষহরিকি। আমার হাতের জল ফুল নিয়া শান্ত কর মা। অন্য জায়গায় যদি যাবে ডাইনে বামে কণ্ঠে বসিবে। (পঃ বঙ্গের পূজা-পার্বণ মেলা প্রথম খণ্ড)

১২। পঃ বঙ্গের পূজা-পার্বণ ও মেলা ১ম খণ্ড।

১৩। ধাওয়াইল গ্রামে আহুল মারা থানে যোগ চিহ্নের মতো একটি গর্ত খোঁড়া হয় দেখেছি।

১৪। অনুরূপ ধাওয়াইল গ্রামেও অনুষ্ঠিত হয়—দ্রঃ কংসব্রত একটি প্রাচীন অনুষ্ঠান—মধুপর্ণী শারদীয় ১৩৮৪

১৫। এই কংসের বেদি আর কিছু নয়, কষ্টি পাথরের ভগ্ন নারায়ণ মূর্তি।

১৬। পশ্চিমবংগের পূজা-পার্বণ ও মেলা প্রথম খণ্ড

১৭। মধুপর্ণী (বালুরঘাট) শারদ সংখ্যা

H.E. Stapleton J.P.A.S.B. vol XXVIII (1932)

২০। বাংলার ইতিহাসের দুশো বছরঃ স্বাধীন সুলতানদের আমল : সুখময় মুখোপাধ্যায়।

২১। ওই অঞ্চলে মহেন্দ্র নামে একটি গ্রাম এই ঐতিহাসিক বিষয়ের এখনো সাক্ষী।

২২ এবং ২৩. H.E. Stapleton—J.P.A.S.B. Vol. XXVIII (1932)

২৪। ১৯৩২ সালে এশিয়াটিক সোসাইটির জর্নালে (Vol. XXVIII) প্রকাশিত অধ্যাপক সরসীকুমার সরস্বতীকৃত এই ব্যাখ্যাটি ডঃ সুকুমার সেন গ্রহণ করতে অসম্মত। বছর তিনেক আগে 'অমৃত' পত্রিকায় এই লেখাটি প্রকাশিত হওয়ার পর ডঃ সেনের সঙ্গে এ বিষয়ে আমার আলোচনা হয়। কিন্তু এ বিষয়ে তাঁর কোন লিখিত প্রতিবাদ পত্র আমার কাছে নেই। ওই শিলালেখটির পাঠ ডঃ সেন আমাকে বলেন— বলিবধং ঠক্কুরঃ। অর্থাৎ বালিকে বধ করে ছিলেন যে ঠাকুর।

ধাওয়াইলের কংসব্রত মেলা ॥ মালদহ জেলার উত্তর প্রান্তে পঃ দিনাজপুরের গা ঘেঁসে যে গ্রাম সেই ধাওয়াইলের-কংসব্রত মেলার কথা প্রথম জানি ভারত সরকার প্রকাশিত (১৯১৮৷ পশ্চিমবঙ্গের পূজা পার্বন ও মেলা—১ম খণ্ড বইটির একটি প্রতিবেদনে। তারপর, ১৯২২ সালে পঃ দিনাজপুর জেলার বাঘন গ্রাম নিবাসী সর্বোদয়ব্রতী পবিত্র দে সেই মেলা ও অনুষ্ঠানের রিপোর্ট সংগ্রহ করার জন্যে পাঠান কালিয়াগঞ্জ থানার রামপুর গ্রামের শ্রীহরেন দেবশর্মাকে। আমি সেই বছরই পবিত্রবাবুর সহযোগিতায় করঞ্জী (পঃ দিনাজপুর) গ্রামের কাষ-ব অথবা কংসব্রত দেখতে যাই। এবং পরের এক বছরের চেষ্টায় আমি করঞ্জী গ্রামের কংসব্রত অনুষ্ঠান ও তার গীত সংগ্রহ করতে সক্ষম হই। ১৯২২ বঙ্গাব্দের মধুপর্ণী (বালুরঘাট) পত্রিকার শারদ সংখ্যায় অধ্যাপক মিহিররঞ্জন লাহিড়ী কংসব্রত—একটি প্রাচীন অনুষ্ঠান নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। তাছাড়া, যুগান্তর সাময়িকীতেও এই বিষয়ে একটি লেখা দেখেছি। লেখকের নাম মনে নেই। করঞ্জী গ্রামের অনুষ্ঠানের সঙ্গে ধাওয়াইলের অনুষ্ঠানের সময়গত ও নামগত মিল দেখে ১৯২২ বঙ্গাব্দে আমি নিজে এই গ্রামে এই অনুষ্ঠান দেখতে যাই। সে গ্রামে গিয়ে জানতে পারি যে অধ্যাপক ডঃ প্রদ্যোত ঘোষ আগের বছর এ গ্রামে এসেছিলেন। তিনি

আনন্দবাজার পত্রিকা গোষ্ঠির ভূমিলক্ষ্মী পত্রিকায় † ২৯ মাঘ ১৯২২ সংখ্যায় কংসব্রতমেলা শিরোনামে একটি নিবন্ধ লেখেন। একই বিষয়ে চারজন ব্যক্তির সরেজমনি ক্ষেত্র-অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে চারটি লেখা পড়ার পরও কিছু কথা থেকে যায়। আপাততঃ ডঃ প্রদ্যোত ঘোষ প্রসঙ্গে কিছু কথায় আসছি।

এক ॥ ডঃ ঘোষ নিবন্ধটির নাম দিয়েছেন কংসব্রত মেলা। কিন্তু মেলা বিবরণী রয়েছে মাত্র কয়েকছত্র। অথচ এই মেলা বিবরণী বিস্তৃত হলে এই অনুষ্ঠানটির প্রাচীন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং তার ক্রমবিবর্তন ও পরিবর্তনের ধারা সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কতকগুলি বৈশিষ্টা সম্পর্কে অবহিত হওয়া যেত। গ্রামীণ মেলাগুলি নিয়ে উল্লেখযোগ্য গবেষণা এখনও হয়নি। মেলার মধ্য দিয়ে জনজীবনের বিভিন্ন দিকের সন্ধান পাওয়া যায়। উত্তরবঙ্গের দেশী পলিয়াদের মধ্যে কাজ করতে গিয়ে দেখেছি, এখানে এক দিনের জন্য মেলা বসলে বলা হয় বাজার। একাধিক দিনের জন্য হলে বলা হয় মেলা। এ বিষয়টির উপর গবেষকদের নজর দেওয়া দরকার। প্রসঙ্গত স্মর্তব্য যে এই অঞ্চলের প্রাচীন ইতিহাস বাংলার ইতিহাসের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। যার বিস্তৃত বিবরণ এখনও অজ্ঞাত।

দুই ॥ অধ্যাপক ঘোষ একজন ধীমান গবেষকের মতোই মেলা ও অনুষ্ঠানটিকে কয়েকটি পর্যায়ক্রমে সাজিয়েছেন। কিন্তু এর ব্যাখ্যা অংশটি সম্পূর্ণ বিভ্রান্তিকর বলে আমার ধারণা। তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন যে এই একই অনুষ্ঠানের কথা করঞ্জী ও যাত্রাডাঙ্গাতেও শোনা গেছে। কিন্তু এই দুটি গ্রামের অনুষ্ঠান তিনি দেখেছেন বলে মনে হয় না। যেহেতু, একমাত্র ধাওয়াইলের মধ্যেই এই বিশেষ অনুষ্ঠানটি সীমাবদ্ধ নয়, সুতরাং ধাওয়াইল-নির্ভর এই ব্যাখ্যা সমীচীন নয়। তাছাড়া একটি গ্রামীণ অনুষ্ঠানের উপর তার পশ্চিমাঞ্চলের প্রভাব পড়তে পারে। *নৃতাত্ত্বিকরা এমন কথা বলেন। প্রসঙ্গত জানাই, যাত্রাডাঙ্গাতে দীর্ঘকাল ধরে আর এই অনুষ্ঠান হয় না। ১৯৭৮ সালের মারচ মাসে পঃ দিনাজপুর-মালদা জেলার সেটেলমেন্ট অফিসার বন্ধুবর কানাইলাল মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে মালদা থানার হালনা যাত্রাডাঙ্গা গ্রাম

† অধুনা লুপ্ত

* সূত্রঃ ডঃ এন. চৌধুরী, বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক, সোস্যিওলজি এণ্ড সোসাল এনথ্রপলজি, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়।

গিয়েছিলাম। হালনা একসময়ে বসতিহীন ছিল (দ্রঃ সেন্সাস রিপোর্ট)। যাত্রাডাঙ্গা বর্তমানে মুসলমান-প্রধান গ্রাম। তবে একসময়ে হালনা-যাত্রাডাঙ্গার মধ্যবর্তী অংশে কয়েকঘর পাল পদবীধারী মানুষ বাস করতেন বলে ওই গ্রাম থেকে জানা যায়। যাত্রাডাঙ্গা গ্রামে কেউই কাষ-ব অথবা কংসব্রত অনুষ্ঠানের কথা জানেন না। তাই আমার বিস্মিত প্রশ্ন : অধ্যাপক ঘোষ কী করে সেখানে ব্রত গানের সন্ধান পেলেন? করঞ্জী গ্রামে 'কাষ-ব' উপলক্ষে যে গান হয়, তার সন্ধান আমিই প্রথম নিই ও সংগ্রহ করি। ১৯৩২ সালে তৎকালীন বাংলার শিক্ষা অধিকর্তা এইচ ই স্টেপেলটন ও অধ্যাপক সরসীকুমার সরস্বতী করঞ্জী গ্রামে এসেছিলেন। স্টেপেলটন সাহেব কংসপূজার কথা প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছেন, কিন্তু ব্রতগান নয়। পঃ বঙ্গের পূজাপার্বনেও তা অনুল্লিখিত। তাছাড়া ব্রত গায়কগণ ও গ্রামবাসীরাই স্বীকার করেছেন যে, আমার আগে

১৯২২ কেউ এই ব্রতগান বিষয়ে কোন আগ্রহ প্রকাশ করেননি। অধ্যাপক ঘোষ ব্রতগান বিষয়ে যে তথ্য দিয়েছেন, তা সম্ভবত কাল্পনিক। তাই বলা যায় : মেলা অনুষ্ঠান সম্পর্কে গৃহীত তথ্য থেকে খুব দ্রুত কোন সিদ্ধান্তে আসতে গেলে প্রায়শঃই ভ্রান্তি দেখা দিতে পারে। বরং সাধারণ গ্রামবাসীর ব্যাখ্যা ও মতামত এ ক্ষেত্রে গ্রহণীয় এবং তা থেকে কোন সূত্রের আভাস পেলে তা উল্লেখ্য।

তিন ।। করঞ্জীর অনুষ্ঠানে গানে ব্রহ্ম প্রসঙ্গ রয়েছে। এ তথ্যটি জানলে অধ্যাপক ঘোষের সুবিধে হতো।

চার ।। ধাওয়াইল গ্রামে কংসের ধড় বলে বর্ণিত মূর্তিটি আসলে একটি ভগ্ন নারায়ণ মূর্তি।

ধাওয়াইলের কংসব্রত ও মেলা অনুষ্ঠান সম্পর্কে আমার সংগৃহীত তথ্যগুলি এ পর্যন্ত সর্বত্রই অনুল্লেখিত। এই অবকাশে নিচে তা দেওয়া হলো।

এক ।। পাটকালী বহনকারী ও প্রধান ভক্তার চার পুরুষের নাম যথাক্রমে : কুড়ামুচন্দ্র পাল, হরিশচন্দ্র পাল, ভোলা দাস, দিনেশ পাল এবং লক্ষণীয় ব্যতিক্রম —ভোলা দাস।

দুই ।। আহুলমারা স্থানটি দেবোত্তর নয়। প্রাক্তন জমির মালিক কৃষ্ণজীবন সান্যাল। তাঁর ম্যানেজার মনোহর ঘোষের উপর পরবর্তীকালে তার মালিকানা বর্তায়। মনোহর ঘোষের কাছ থেকে তাঁর আত্মীয় চারুচন্দ্র

পাল এই জমি কিনে নেন। তারপর চারুচন্দ্র পালের কাছ থেকে ওই জমি ৪।৫ বছর আগে কার্তিক ও গণেশ পাল খরিদ করেন। কার্তিক গণেশ পালের সঙ্গে চারুচন্দ্র পালের সম্পর্ক হল : আপন মামার জেঠতুতো ভাই। ফলত— চারু পাল কার্তিক গণেশের মামাতো ভাই।

তিন ॥ পূর্বে এই গ্রামের জমিদার ছিলেন পাণ্ডুয়ার সামন্তর নাহার বিবি। এই জমিদারের পাশেই ছিল চূড়ামন জমিদারের মৌজা। এই চূড়ামন জমিদার করঞ্জীর জমিদার ছিলেন।

(সুতরাং অধ্যাপক ঘোষ প্রদত্ত তথ্যটি সঠিক নয়।)

চার ॥ ধাওয়াইল গ্রামের লোকসংখ্যা কয়েকজন গ্রামবাসীর মতে ৬০'র মতো। এর মধ্যে মুসলমান ৭০ জন। পলিয়া ৬০ জন। তাঁতি ২ ঘর (পদবী গা?ন) সাঁওতাল কোল কোড়া প্রভৃতি যারা বাইরে থেকে এসেছে ৭৫ জন। কুম্ভকার প্রায় ২০০ জন। বর্তমানে ব্রাহ্মণ নেই কিন্তু আগে তিনজন বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন।

পাঁচ ॥ আহুলমারা থানের ভাবপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম শুক সিং। তিনি জাতিতে পাহাড়িয়া। এরা পুরুষানুক্রমে অনেক দিন ধরেই এখানে আছেন। তাঁর পূর্বে থোকা পাহাড়িয়া এই দায়িত্ব বহন করেছিলেন। কিন্তু বহু পূর্বে এই কাজ করতেন ভোথল জাতি (তথ্য সরবরাহক নরেশচন্দ্র পাল)। শুক সিং এর কাজ আহুলমারা থানের যজ্ঞ-স্থল নির্মাণ, তেঁতুল কাঠ জোগাড় করা ইত্যাদি।

ছয় ॥ পাটকালী নির্মিত হয় শাল অথবা নিম কাঠে। বর্তমান পাটকালী নিম কাঠের তৈরি। ১২।১৪ বৎসর আগে নগেন্দ্রনাথ পাল ২১ হাতের একটি নিম কাঠের তক্তা দেন পাটকালীর জন্য।

সাত ॥ ধাওয়াইল গ্রামের পূর্বদিকের গ্রামের নাম উত্তর বিজলবাড়ি। এখানে আগে কোচ ও পলিয়াদের বাস ছিল। এ অঞ্চলের পুকুর থেকে ১৫ বৎসর আগে শিব, বিষ্ণু, ও বড় বড় পাথরের চাঁই পাওয়া গিয়েছিল। দক্ষিণদিকে জোর দিঘি ও পাঁচাহার নামক ২টি সাঁওতাল পল্লী। পশ্চিমে পঃ দিনাজপুরের মূলা-হাট নামক মুসলমান পাড়া। উত্তরে পাকোর ও দান গ্রামে যথাক্রমে মুসলমান ও হিন্দু (ঘোষ) সম্প্রদায়ের বাস।

আট ॥ ধাওয়াইল গ্রামটি ঠিক সমতল নয়। বেশ কটি সজল টলটলে দীঘি

আছে, একটি পুরানো কূপও আছে। এই গ্রাম থেকে অনেক কষ্টি পাথরের মূর্তি এক সময় পাওয়া গিয়েছিল। গ্রামের চেহারা বেশ সম্পন্ন। এখানকার মাটিতে ফসলের ফলন ভাল। গ্রামে বিদ্যুৎ এসেছে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নরেশ পাল প্রমুখের চেষ্টায়।

নয়॥ গ্রামের পুরোনো কথা জানতে গেলে বয়েস বলতে না পারা অথর্ব বৃদ্ধ ভূষণচন্দ্র পালের কাছে যেতেই হয়। আর অতিথি সেবার জন্য হাসিমুখে রয়েছেন প্রধান শিক্ষক নরেশ পাল।

দশ॥ নরেশ পাল বলেন, এই গ্রামের প্রধান ও একমাত্র বড় উৎসব এই কংসব্রত। দুর্গোৎসব এ গ্রামে প্রচলিত নয়। সাংবাৎসরিক এই অনুষ্ঠানের মেলায় গ্রামের সকলে সারা বছরের প্রয়োজনীয় সামগ্রী কিনে রাখেন ঘরে। কিন্তু ক্রমশঃ এই মেলা দুর্বল থেকে দুর্বলতর হচ্ছে। পূর্বে মুসলমান জমিদাররা এই অনুষ্ঠানের বিরোধিতা করেছিলেন। তা সত্ত্বেও গ্রামের মানুষের আগ্রহেই এই অনুষ্ঠান ও মেলা টিঁকে আছে। (প্রসঙ্গত স্মরণীয় যাত্রাডাঙ্গার অনুষ্ঠানের কথা এ গ্রামে প্রচলিত ছড়ায় পাওয়া যায়। কিন্তু এ গ্রামে এই অনুষ্ঠান অপ্রচলিত।)

এগারো॥ এ বছরের মেলায় পুতুল খেলা, কূপের সাইকেল খেলা সবচেয়ে আকর্ষণীয় ছিল। দোকানপাটগুলো জমেনি তেমন। বিভিন্ন দোকানদারদের যে সাক্ষাৎকার নিয়েছি, তা থেকে পরিষ্কার যে, ক্রেতার সংখ্যা কম, তাই লাভের বদলে লোকসানই হয়। মহম্মদ হোসেন মেদিনীপুর ও অন্যান্য জায়গার মাদুর নিয়ে এবার এসেছিলেন। ৫ বছর বাদে তিনি এলেন এই মেলায়। মা ভারতী পতুল নাচ নিয়ে এসেছেন নালাগোলার বীরেন বিশ্বাস। মুদি মনোহারি দোকান, হরেকরকম জুতোর দোকান, খাবার দোকান, কাপড়ের দোকান সবই আছে—কিন্তু বড় নিষ্প্রাণ। মেলার উদ্যোক্তারা তাই চিন্তিত—কতদিন টিকিয়ে রাখা যাবে এই মেলা কে জানে!

গানের নাম চৈতা। পশ্চিম দিনাজপুর জেলার সীমান্তে একটি গ্রাম। নাম বাঁশবাড়ি। গ্রামসভা তার নলবাড়ি। সকলা বাঁশে ঘেরা এই গ্রামের ধার দিয়ে বয়ে গেছে মাহান্দী বা মহানন্দা নদী। বাঁশবনের ফাঁক দিয়ে দেখা যায় দুরান্তে এক পীচ ঢালা জাতীয় সড়ক। শান্তশ্রী গ্রামে ভেসে আসে সাঁই সাঁই শব্দ। কোন যন্ত্রযান চলেছে তখন আসাম শিলিগুড়ি অথবা কলকাতার পথে।

বাঁশবন ছাড়িয়ে কয়েক মাইল পশ্চিমে হাঁটলে নজরে আসে ব্রড-গেজ ও মিটার গেজ রেল লাইন। মাইল ত্রিশেক দূরে যে রেল ষ্টেশন তার নাম আলুয়াবাড়ি।

ওই বাঁশবাড়ি গ্রামে চৈত্র সন্ধ্যায় চারদিক থেকে মেয়ে-পুরুষের যে গান ওঠে তার নাম চৈতা। এই চৈতা ছড়িয়ে পড়ে মহানন্দা নদী পাড় তুরিয়াখালি চিতোল ঘাটা গ্রামে। জেলার নাম তখন দার্জিলিঙ।

এই চৈতা গানের শুরু পহেলা চৈত্রের সন্ধ্যায়। আর শেষ চৈত্র-সংক্রান্তির রাতে। পুরুষেরা সঙ্গতে নিয়ে বেরোয় খোল, মঞ্জুরা আর দোতারা। মেয়েরা শুধু গলায় ঘরে বসেই সুর তোলে গানের রেশ ধরে।

'পড়ি গেল চৈতকে ধুপ
আরে নেহারোয়া কৈসে
যাইবহোরে—'

"চৈত্রের রোদ শুরু হ'ল। এখন কি করে ওই প্রখর রোদের দিকে তাকাব?"

এরপর এক চৈতা গায়ক প্রশ্ন ছোড়েন :

'কোনা মাসে আমআরে
মঞ্জরী গেলহো রামা
কোনা মাসে ধরলে টিকর ?

"কোন মাসে আমের মঞ্জরী (মুকুল) কোন মাসেই বা তার গুটি ?"।

চৈতা গায়িকার জবাব :
'মাঘমাসে আমআরে মঞ্জরী গিল
চৈতা মাসে ধরালে টিকর।'

'মাঘ মাসে আমের মঞ্জরী আর চৈত্রমাসেই তার গুটি।'

চৈত্রের ধুপ অসহ্য হ'তে পারে, কিন্তু এ মাস উৎসবের। ঘাটো ব্রত, গমীরা আর সিরুয়া। বিশেষত সিরুয়া পরবে একে অন্যের গায়ে ছুঁড়ে দেবে ধুলো মাটি আর কাদা। প্রেম ভালবাসা মিলনের পরব এই সিরুয়া। ঘাটোব্রতকে কেন্দ্র করে বাড়ি বাড়ি উৎসবের সাজ। ঘরের দেওয়ালে পড়বে রঙের ছোপ। আঁকা হবে কত ফুল, পাখি। এই সময়ে প্রোষিত ভর্তৃকার বিরহ বেদনা জাগে

"শুন হরি নগরিয়া, সৈঁয়ারে বিনে
হায়রে মরি, রামা—
সৈঁয়া বিনা শূন্য ভেলা।
অনধন যৌবন কি লাগি বাঢ়ালি
ছোটি ননদি হো !
হায়রে মরি রামা, কি লাগি
বাঢ়ালি নবকেশয়া।"

'নগরিয়া শোন, সৈঁয়াবিহীনা আমি হায় ! সৈঁয়া বিনা সবই শূন্য হলো। অন্ন-ধন-যৌবন কি জন্য সমৃদ্ধ ? কি লাভ ! কি জন্যই বা কেশের এই নবসাজ !'

এই রকম বিরহ-বেদনার ছবি আছে অসংখ্য চৈতা গানে। আবার এমন ছবিও আছে যেখানে যুবতী নারীর বালক সোয়ামী। উত্তর-বিহারে, উত্তরবঙ্গে কোন কোন সমাজে এই সামাজিক ছবি দুর্লভ নয়।

'শুতালারে বালে মোহারে হায়
কৈঁসে কেরে জাগায়মো হে।
গটাভরি অগর চন্দন লহ হে রামা
ছিঁটি ছিঁটি সৈঁয়ারে জাগায়েরে
হে রামা
ছুঁড়ি ফিকি মারাল পাঁজর
ডাকি হে রামা।
তাঁহু কি জাগে
মূর্খ গামারিল হে রামা।'

'ঘুমিয়ে আছে আমার বালক সোয়ামী। কি করে ওকে জাগাবো? পাত্রভরা অগুরু চন্দন ছিটিয়ে সৈঁয়াকে জাগাতে যাই। ওর গায়ে পাঁজরে খোঁচা দিই তবুও কি ও জাগে! ও একটা মূর্খ অবোধ, হায়!'

যন্ত্রণাময় দাম্পত্যজীবনের ছবি। যৌনকাতর রমণীর কান্না।

এই সব গানের ভাষা লক্ষণীয়। ব্রজবুলীর কথা মনে পড়ায়। চৈতা গানের গ্রাম তো মৈথিলী ভাষাভাষি এলাকার মধ্যেই। যদিও এই গ্রামের বাসিন্দারা বাঙালী এবং নিজেদের মাহিষ্য বলে পরিচয় দেন—কিন্তু চৈতা গানে তারা প্রতিবেশি সকলের সঙ্গী।

আমি জিজ্ঞাসা করেছি চৈতা গায়ক সুরেন দাসকে 'জ্ঞানদাসের গান জানেন আপনারা?' সুরেনেব সহজ সরল চোখে অজ্ঞতার ভাষা। তবু আমার জ্ঞানদাসের কথা মনে পড়ে যখন শুনি—

বাঁশী না দিলো রহিতেরে
অহোরে মোর চরার বাঁশীরে
এখেতো বাঁশের বাঁশীরে
ফিন্দো গটার গটি
কেমন জানিল বাঁশীরে
রাধা কলঙ্কিনী
এখেতো বাঁশের বাঁশীরে
পিতলারে ছাউনি
আঙুলে টিপতে বাঁশীরে

বলে রাধা রাধা
অহোরে মোর চরার বাঁশীরে
লাগাল যদি রে পাউ
আগাল গোচ কাটিয়া বাঁশীবে
সাগরে ভাসাউ ॥'

গত বারো বছবে উত্তববাঙলার বহু গ্রাম ঘুরেছি, কিন্তু বাঁশবাড়ি, তুবিয়া-খালি, চিতোল-ঘাটা ছাড়া আব কোথাও চৈতা গান শুনিনি।
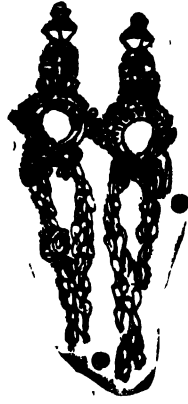
'তুই মোক্ ছাড়িয়া পালাল গে বিদেশ'। মহানন্দা এখানে পশ্চিমমুখী। তারই ঘোলা জলে লাল আবীর, লাল আবীর পশ্চিমের আকাশেও। অস্তাচলে সূর্য।

পূবের আকাশ থেকে খুবই দ্রুত গুঁড়ো গুড়ো অন্ধকার ছড়িয়ে পড়ছে। মহানন্দার আবীর মাখা জলে সে গুঁড়ো পড়ছে। অদূরেই জাতীয় সড়কের ব্রীজ। অন্ধকার সেখানেও ঝরছে। উত্তরের ঝোপঝাড় ততক্ষণে কালিঝুলি মাখা।

ওরা সারবদ্ধ দাঁড়িয়ে আছে মহানন্দার দক্ষিণ পাড়ে। কতক নেমেছে নদীর জলে. কলার ভুরা (ভেলা) নিয়ে, সেইসব ভুরায় জেলে দিচ্ছে চেরাগ বাতি। ছোট ছোট ভুরায় ভেসে চলে সার সার চেরাগ বাতি। এরপর ওরা মহানন্দা পাড়ে নদীজলে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে—

তুই মোক্ ছাড়িয়া পালাল্ গে বিদেশ
ও মুই বেড়াউ কান্দিয়া।

ওদিকে মহানন্দার ব্রীজ কাঁপিয়ে জাতীয় সড়ক দাপিয়ে গুঁই গুঁই আওয়াজ তুলে ছুটে চলেছে যন্ত্রযান কলকাতা অথবা শিলিগুড়ির পথে।

ওদের কান্নার স্বর নদীর ঢেউয়ে ঢেউয়ে হাওয়ায় ভেসে ছড়িয়ে যায়। সন্ধ্যার আলো-আঁধারি কাপড়ে ঢাকা মহানন্দার বুকে ছোট ছোট চেরাগ-গুলো তখন কয়েকটি আলোর বিন্দু।

মুঠো মুঠো জোনাকি অন্ধকারের বুকে। ওরা ফেরে গাঁয়ের মেঠো পথ ধরে। গলায় ওদের কান্না গান হয়ে সুর তোলে—

শুনি হামরা মাইবাবার রুধুনা

ওরে তোর মায়ের কান্দনে মাহান্দি নোদি বহে
ওরে তোর বাপ কান্দেছে বাইরি ঘরৎ বসে
ওরে তোর ভাইর কান্দনে বুক ভিজি যাছে।

(আমরা শুনি তোর মা বাবার কাঁদন। তোর মায়ের কাঁদনে মহানন্দা নদী বয়ে যায়। তোর বাবা কাঁদে বাইরের ঘরে বসে। ও তোর ভাইয়ের কাঁদনে সবার বুক ভিজে যায়।)

ওদের সকলের হাতে হাতে বলি দেওয়া কোতরের (কবুতরের) ডালি। অস্তাচল সূর্যের রক্তিম আলোয় মহানন্দার জলে ওরা সকলে কোতর উৎসর্গ করেছে তিস্তাবুড়ির নামে।

তিস্তাবুড়ি সালাম দে—
তিস্তাবুড়ি বাটখরা কুয়াঁর।

প্রতিটি কোতরের গলা ছিঁড়ে ছিঁড়ে রক্ত ছিটিয়ে দিয়েছে মহানন্দার জলে, তিস্তার নামে। তারপর শেষ পূজো পূজেছে ঘাটো-মণি, ভায়া ঘাটো আর কুতুয়ালকে। ছোট ছোট কলার ভুরায় জ্বালিয়েছে চেরাগ বাতি, ভাসিয়েছে মহানন্দার জলে একে একে।

এইভাবে সাঙ্গ হয় মাসজোড়া ঘাটো ব্রত। আবার আসবে ফিরে পয়লা চৈত্র। আবার আয়োজন হবে ঘাটো ব্রত। সারা চৈত্র মাস ধরে চলবে গান অনুষ্ঠান আর সাঙ্গ হবে ব্রত এইভাবে পয়লা বৈশাখের সন্ধ্যারাগে।

ওরা ঘাটো ব্রতিনী। জাতিতে কেউ রাজবংশী, কেউ নবশাখ, কেউ মাহিষ্য। ওরা চৈত্রমাসের জন্য ছট্‌ফট্ করে পুরুতঠাকুর—'পাঞ্জিয়ার ভাইয়ে'র কাছে যায় বুঝ করতে।

লেখাপড়ি করহে পাঞ্জিয়ার ভাই
চৈত্তের আছে কতদিন।

কারো কারো বুঝ করতে দেরী হয়ে যায়। 'পাঞ্জিয়ার ভাই' বলে—'সারা চৈত্ত গেল হে গিরসের বহু' (চৈত্রমাস সারা হয়ে গেল হে গেরস্থের বউ); এ কথা

শুনে গেরস্থের বউ 'ধলো ঘাটর গে চরণ / কলোয় মাটি গে গিরসের বউ / ঢালায় গে পিড়া'। তারপর সিন্দুর দিয়ে সেই 'পিড়া' বা আসন গেরস্থের বউ পুজো করে।

ঘাটো ব্রত কাহিনীতে জানা যায় এ সব। ঘাটো পুজোয় কি লাভ হয়? তার উত্তরও আছে ব্রত-কাহিনীতে। গোলা ভরে যায় ধানে। নদী বা সাগরে ডুবে যাওয়া সওদাগর স্বামী বেঁচে ওঠে আর কোল ভরে যায় পুত্র-সন্তানে। হারিয়ে যাওয়া ভাই পায় বোন। ননদ-ভাউজির সম্পর্কে হয় সুমধুর।

যদি বা এসব না পাওয়া যায়, তবু ব্রতিনী ঘাটো পুজো করে। চৈত্রমাস এলেই গাঁয়ের মেয়ে-বউরা কারো একজনের বাড়ি একত্র হয়ে ঘাটো কাহিনী সুর করে গান গায়।

ঘাটোমণি এক কুমারী মেয়ে। নানা ঘটনা তাকে-নিয়ে। অবশেষে একদিন তার বিয়ে হয় নগর কোটালের সঙ্গে। সেই বিয়ের অনুষ্ঠান চৈত্র মাসের শেষ দিন। ২৯ চৈত্র তার অধিবাস, আর পয়লা বৈশাখ শ্বশুরবাড়ি পথে যাত্রা। গাঁয়ের মেয়েরা ঘাটোমণির বিয়ে দেয় নিজের মেয়ের মতোই।

'বাইজন' বাজে অধিবাসীর দিন সকাল থেকেই। মাদলের গুমাগুম শব্দে চারিদিকে সাড়া পড়ে যায়। তাঁতিভায়া খানচারি কাপড় দিয়ে যায়। বানিয়াভায়া (স্বর্ণকার) দিয়ে যায় গহনা, শাঁখারিয়াভায়া শাঁখা, সিন্দ্‌রা-ভায়া সিন্দুর গুড়িয়ালভায়া চার টিন গুড়। কাশাই (এক ধরনের গাছ) হলুদ সবই জোগাড় হয় ঘাটোমণিব বিয়ের অনুষ্ঠানে।

২৯ চৈত্র সারারাত ধরে ব্রতিনীরা অধিবাসের গান করে। ৩০ চৈত্র সকাল থেকেই বিয়ের গান। বিয়ের আয়োজন। ছাম গাইনে (উদুখলে) কোটা হয় হলুদ, কাশাই। ব্রতিনীরাই সেই সব গায়ে মেখে স্নান করে কল্পিত ঘাটোকে নিয়ে। এই স্নানের পূর্বে হলুদ ছোঁড়াছুঁড়িও হয় পরস্পর।

সেদিন গাঁয়ে গাঁয়ে সব ঘরবাড়ি, উঠোন তকতকে নিকোনো। বাড়ি বাড়ি মাটির দেওয়ালে লাল সাদা রঙের পরশ। লতা-ফুল-পাখির চিত্রন। প্রতিটি ঘরেই যেন 'ফুলকোফুরা' অর্থাৎ ঘাটোমণির বাসর ঘর।

দুপুরে গাঁয়ের ঘর ঘর থেকে আঁকুয়ার কুঁয়ার (কুমারী-অকুমারী) মেয়েরা সাজিতে ভরে নিয়ে আসে ধুতুরা ফুল। আর ঘাটো, কুতুয়াল, মাল্লিন, ভায়া ঘাটোশির (ঘাটশ্রী) মূর্তি। সবই মাটির তৈরি। কুতুয়াল বা কোটালের

মূর্তি শুধু একটি পুরুষ জননাঙ্গ। মালিয়ান বা মালিনী হলো একটি ছোট হাঁড়ি। আর ঘাটো হলো একটি বড়োসড়ো ঘট। আর কয়েকটি ছোট ছোট ঘট হলো ভায়া ঘাটো। এইসঙ্গে ব্রতিনীরা নেয় ছাতুর নৈবেদ্য। গাঁয়ের একটি বাড়ি আগে থেকেই স্থির করা থাকে সেখানে সবাই দেবে পুজো।

সেদিন দুপুরে ব্রতবাড়ির অঙ্গনে একটি চাঁদোয়া টাঙ্গানো। সেই বাড়ির ধাপিতে (বারান্দায়) থাকে সদলে ঘাটো। একে একে নানা বয়সের ব্রতিনীরা আসে সাজি ভরে ধুতুরা ফুল আর ছাতুর নৈবেদ্য নিয়ে। ঘাটোর আসনে তা নিবেদিত হয়। ফুল-নৈবেদ্যে ধীরে ধীরে ঢেকে যায় ঘাটো। কুতুয়াল, মালিয়ান আর ভায়া ঘাটো। এই ঘাটোর মূল পূজারিণী সে বাড়ির গিরসের বহু।

নাচে গানে চৈত্র সংক্রান্তির রাত শেষ হয়। শুভ নববর্ষের আলো ফুটে ওঠে। প্রহরে প্রহরে সকাল গড়িয়ে দুপুর, দুপুর গড়িয়ে বিকেল। এরই মধ্যে ব্রতিনীরা নিজেরা কলা গাছের বাকল কেটে গড়ে তোলে ছোট ছোট ভূরা, ভেলা, বা নৌকো। আর কলার বাকলেই তৈয়ারি হয় চিরাগ বা প্রদীপ।

ঘাটা ব্রতিনী মেয়েরা সূর্যাস্তের আগে মহানন্দা নদী পাড়ে গিয়ে দল বেঁধে দাঁড়ায়। সঙ্গে তাদের বলি দেওয়ার জন্য কোতর বা কবুতর। সূর্যাস্তের রক্তরাঙ্গা মহানন্দার জলে কবুতরের মাথা ছিঁড়ে রক্ত ছিটিয়ে দেয় তারা। বন্দনা করে তিস্তাবুড়ি, উত্তরাকালী, আর হরেক দেব-দেবীর। তারপর একে একে পুজো করে কুতুয়াল, ঘাটোশির, মালিয়ান, ভায়া ঘাটো আর ঘাটোমণিকে। তারপর সূর্য ডুবুডুবু মুহূর্তে ভুরায় তুলে দেয় তাদের একে একে। সাজিয়ে দেয় চেরাগবাতি। তারপরই তাদের গলায় কান্না গানের সুর তোলে।

তুই মোক্ ছাড়িয়া পালাল্ গে বিদেশ .
ও মুই বেড়াউ কান্দিয়া। *

---

* ঘাটো-ব বা ঘাটো ব্রত উত্তরবঙ্গের বহু গাঁয়েই পালিত হয়। তবে এখানে পশ্চিম দিনাজপুর জেলার পুর্ণিয়া ঘেঁষা বাঁশবাড়ি গ্রামের অভিজ্ঞতাই বর্ণনা করা হয়েছে। ১৯২২ সালে এপ্রিল মাসে ঘাটো ব্রতর সময় ওই গাঁয়ে গিয়ে আমি এই অনুষ্ঠান দেখেছি, গান ও তথ্য সংগ্রহ করেছি। বিষ্ণুপদ দাস (বর্তমানে গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান) সুরেন দাস এবং অন্যান্য গ্রামবাসীদের সহযোগিতা এই প্রসঙ্গে সকৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি।

গম্ভীরা শব্দটির সঙ্গে আমরা অনেকেই পরিচিত। কিন্তু, 'গমিরা' আমাদের অনেকেরই অপরিচিত। চৈত্র সংক্রান্তি কি তারও দু' চারদিন আগে থেকেই উত্তরবঙ্গের গাঁয়ে গাঁয়ে বিশেষতঃ পশ্চিম দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, কোচবিহারে এই 'গমিরা' শুরু হয়ে যায়।

রাজবংশী, পলিয়া অধ্যুষিত গাঁ গুলোতে গমিরা চলে আষাঢ় মাসের অম্বুবাচী তিথি পর্যন্ত। কাঠের মোখা বা মুখা পরে ভক্তের দল বাড়ি বাড়ি ঘুরে নাচে। এর নাম ফুল ঝারি। তারপর গমিরা তলায় জড়ো হয়। পূজো দেয়। চামাড় কালী, মাশনি ও মাশনি কালী, বুড়া-বুড়ি, চণ্ডীও শিকনি ঢালের মুখোশ তো একান্তই আবশ্যক।

বাঘ, ভালুক আরো হরেক রকমের মুখোশ পরে ভক্তদের নাচতে দেখেছি এই সময়। এমন কি দুর্গা-অসুরও সাজতে দেখেছি কোন কোন গাঁয়ে। ঢাক বাজে, কাঁসি বাজে এই মোখা নাচের সঙ্গে। একজন দেবাংশী বা পুরোহিত নাচের ক্ষেত্রে মন্ত্রপূত ফুল জল নিয়ে ভক্তদের পাশে পাশে সদাই প্রস্তুত। নাচের আগে, নাচের সময় সেই মন্ত্রপুত জল ফুল ছিঁটিয়ে দেন তিনি ভক্তদের মাথায় মুখোশগুলোর উপর। মুখোশগুলো যাতে প্রাণ পেয়ে ভক্তদের উপর ভর না করে, সে চেষ্টাই দেবাংশী করেন। মুখোশ নাচের আগে একজন ভক্ত কোমরে লাল কাপড় জড়িয়ে একটা হাঁড়িতে পাঠ কাঠি জালিয়ে ঢাকের তালে তালে মুখোশপরা ভক্তদের আরতি করে। এই হাঁড়িটার নাম 'সাঞ্জলের হাণ্ডি।' মুখোশ পরে শুনেছি, অতীতে 'গমির' নাচের আগে 'দেবাংশী' কোন কবর থেকে মৃত মানুষের মাথা সংগ্রহ করতেন। নাচের সময় তাঁর হাতে থাকত সেই মড়ার মাথা। গাঁয়ের মানুষের যার যা কিছু মানত কবুতর, পায়রা তা এই সময় শিকনিঢাল, চামাড়কালী প্রভৃতি দেবতাদের কাছে উৎসর্গ করা হয়। শুনেছি অতীতে কচি-শিশুও বলি দেওয়া হতো।

এখন অতীতের সেই ভক্তি বিশ্বাস নেই বটে, কিন্তু 'গমিরা' নাচ লুপ্ত হয়ে যায় নি।

পা শো সি

লোকযাত্রা ॥ দু-পাশের সবুজের মাঝখান দিয়ে একটি কালো সর্পিল পথ। রাতের অন্ধকারে সব একাকার। মুঠোমুঠো জোনাকি পোকার উল্লাস। সেইসঙ্গে ঝিল্লির সানাই। ঠিক সেই সময় হাড়-কাঁপানো উত্তরের বাতাসে হ্যাজাকবাতির রোশনাই থেকে ছিটকে আসে এক করুণ সুর—'দাদাগে, তোমার লেগে পাগলিনী। স্বপ্ন দেখি দিবানিশি ও না, শিশিরে কি বনসিজে ফোট দেখি কি মন বুঝে।'

ওই সুরের প্রতি কান ফেলে এক পা এক পা করে হেঁটে ছিরামতী গামারের দেশে যে আসরে এসে হাজির হওয়া গেল, তার নাম খনের আসর। 'কি গাউন হচ্ছে হে?' গলা খাঁকারি দিয়ে একজন জবাব দেয়, খন্ 'বুলোসরি গে।'

উত্তরবাংলার এই হল খাঁটি গ্রামীণ যাত্রা। মাথার উপর টাঙানো একটা ছেঁড়া চাঁদোয়া। তাতে গোটা আসর ঢাকে না। শুধু কুশীলবদের আর বাদ্যযন্ত্রীদের মাথা ঢাকে। নীচে মাটিতে পেতে দেওয়া ধোকরার উপর ঘন বৃত্তাকারে বসে আছে ডুগি-তব্‌লা, খোল, হারমোনিয়ম, মঞ্জুরাবাদকের দল। আর তাদের ঘিরেই পুরুষ নায়িকা কেঁদে কেঁদে নায়কের কাছে প্রেমভিক্ষা করছে। সেই কান্নাভেজা গানে মশগুল হয়ে আছে আশপাশের দু-চার গাঁয়ের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা। এক পাশে ঝোলানো হ্যাজাকটা যেন সেই কান্নার অংশী।

রাত কেটে ভোর হয়। খনের গানের বুলোসরী পালায় নায়ক-নায়িকার

মিলনদৃশ্যে দর্শকরা উদ্‌গ্রীব। ওদিকে তখন একে একে উঁকি মারে মাওুয়া ঘরা, শুত্‌পা ঘরার শনের চাল। মাটিতে গড়াগড়ি খায় গোরুগাড়ির চাকা, বিধা আর নাঙ্গল জুঙ্গাল।

রোদ ওঠবার আগেই আসর ভাঙে। সারারাত অভিনয় করে ক্লান্ত শ্রান্ত কুশীলবেরা ঘুমিয়ে পড়ে ফাঁকা আসরে। আর দর্শকরা তখন ভয়ানক ব্যস্ত হয়ে ওঠে তাদের দৈনন্দিন কাজে।

উত্তরবঙ্গের গ্রামীণ জনসাধারণের জীবন অবলম্বন করে এইরকম কত পালা মুখে মুখে রচিত হয়েছে, তার হিসেব নেই। রংপুরের 'নয়নসরী'র স্মৃতি এপার বাংলায় বাহিত হয়ে পশ্চিম দিনাজপুরে বেশ সচল। সেই ধাঁচে গড়ে উঠেছে এখানে বর্মেসরীর গান। অবৈধ প্রেম, নিপীড়নমূলক ঘটনা, যা কিছুই সমাজমানসে ঢেউ তোলে তাই বাঁধা পড়ে খনের গানে। পালার চরিত্রগুলি কথা বলে কখনো গদ্যে, কখনো গানে। সে গদ্য আসরেই রচিত। গানগুলি শুধু আগে থেকে বাঁধা। যেখানেই আবেগ, যেখানেই হৃদয় উজাড় করার প্রশ্ন, সেখানেই গানের নির্ঝর। শুধু গান, শুধু সংলাপ নয়, সেই সঙ্গে আছে প্রয়োজনীয় নাট্যিক ক্রিয়া বা action। গানের সুরে সুরে কুশীলবদের পায়ে জাগে তাল, নৃত্যের দোলায় তখন মঞ্চ ভরপুর। এই নৃত্য উত্তরবঙ্গের সমস্ত পালাগানের এক বিশেষ অঙ্গ। সৈত্‌পীর বা বিষহরা গানেও আছে নৃত্য। 'ব' খেলা গানও নৃত্য-প্রধান।

জলপাইগুড়ি জেলায় খনের গান নেই। সেখানে 'পালাটিয়া' আসর জমায়। দিনাজপুরের মতো পালাটিয়া এখন কোনো গৃহস্থের অঙ্গনে পরিবেশিত হয় না। কোনো পূজা বা উৎসব উপলক্ষে দেবতার ধামে নানা গ্রাম থেকে আসে নানা দল। তারা এসে কেউ নামায় পালাটিয়া কেউ বা 'মোখা'। তাই বোধ করি পালাটিয়ার আরেক নাম ধাম গান।

পালাটিয়ার তিন ভাগ। এক, মান পাঁচাল। দুই, রঙ পাঁচাল। তিন, খাস পাঁচাল। বলাবাহুল্য, এখানে পাঁচাল আর পাঁচালি সমার্থক।

'মান পাঁচাল' মানী ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে পরিবেশিত হয়। বিষয়বস্তু প্রধানত ইতিহাস বা পুরাণাশ্রয়ী। ভাষায় আঞ্চলিক শব্দ নেই বললেই চলে। 'রঙ পাঁচাল'-এর বিষয় সামাজিক, তবে কাহিনী নিতান্তই কাল্পনিক। এ-সব ভাষায়ও মাটির গন্ধ পাওয়া মুশকিল। কিন্তু খাস পাঁচালের বিষয়বস্তু গ্রাম-

জীবনের সত্যমূলক ঘটনার উপর প্রতিষ্ঠিত। এমন-কি, চরিত্রগুলির নাম পর্যন্ত অবিকল থাকে। ভাষা সবটাই আঞ্চলিক। জলপাইগুড়ি কুচবিহার অঞ্চলের সাধারণ মানুষ দৈনন্দিন কথাবার্তায় যে ভাষা ব্যবহার করে তাই খাস পাঁচালের ভাষা। তাই, এর সংলাপ উচ্চারণে কুশীলবদের কোনো জড়তা নেই। বস্তুত খাস পাঁচালের কোনো সংলাপই পূর্ব থেকে নির্দিষ্ট নয়। এগুলি আসরনির্ভর ও উপস্থিত মতো তৈয়ারি।

খাস পাঁচালের সঙ্গে খনের সাদৃশ্য আছে। তবে বৈসাদৃশ্য অনেক। এ আলোচনা অবশ্য এখানে অবান্তর।

পালাটিয়ার তিন অঙ্গেরই প্রয়োগরীতি একেবারেই অভিন্ন। সারা উত্তরবঙ্গে প্রায় সমস্ত পালার ক্ষেত্রেই তার মঞ্চগঠন, বাদ্যযন্ত্রীর অবস্থান এবং অভিনয়রীতি একই রকম। বিষহরা, লক্ষ্মীয়ালা বা কুশাণ, সৈত্‌পীর পালাগানের ক্ষেত্রে যেরূপ, খন পালাটিয়ার ক্ষেত্রে সেই একই রূপ। অর্থাৎ মঞ্চ হল গৃহস্থের অঙ্গন বা বারোয়ারীতলা বা ধামতলার একটি সমতলক্ষেত্র। মাথার উপর একটা চাঁদোয়া বা পরিবর্তে একটি বর্গায়ত চাদর। তারই নীচে ঠিক মধ্যস্থলে বাদ্যযন্ত্রীদের বৃত্তাকার ঘন অবস্থান। এদেরই ঘিরে ঘিরে যেমন বিষহরা, লক্ষ্মীয়ালা, সৈত্‌পীরের গায়েনের গান, ছোকরীদের নাচ পরিবেশিত হয় তেমনি খনের বা পালাটিয়ার কুশীলবদের অভিনয়। ধর্মীয় বা শাস্ত্রীয় গানের ক্ষেত্রে বাড়তি একটি আসর থাকে। সৈত্‌পীরের ক্ষেত্রে তা পশ্চিমমুখী, অন্যদের ক্ষেত্রে উত্তর বা পূর্বমুখী। সমস্ত পালার ক্ষেত্রেই প্রথমে বন্দনা গান—যা অবশ্য-করণীয়। তবে পশ্চিম দিনাজপুর জেলার গায়েন বা কুশীলবদের বন্দনার অংশে উত্তরবঙ্গের অন্য অঞ্চলের, এমন-কি মালদহেরও পার্থক্য বিদ্যমান। বন্দনা অংশের এই পার্থক্যের পেছনে গায়েন বা কুশীলবদের ভৌগোলিক স্বাতন্ত্র্যই যে শুধু কাজ করেছে, তা নয়। একটি জাতিগত ও সামাজিক তাৎপর্য এতে ক্রিয়াশীল। এ কথা শুধু 'বন্দনা' সম্বন্ধেই প্রযোজ্য নয়, সমস্ত পালাগানগুলি সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। উদাহরণস্বরূপ : 'দেশীপলি'-অধ্যুষিত এলাকায় খনের গান প্রচলিত। জলপাইগুড়ি, কুচবিহারের গ্রামাঞ্চলে এ গানের নাম বোধকরি কেউ জানেন না।

পালার বন্দনা গানে যাঁরা অংশগ্রহণ করেন তাঁরাই সেই পালার বিশিষ্ট কুশীলব। বন্দনা অংশে পালার নাম ঘোষিত হয়। লক্ষণীয় যে প্রতিটি

পালায় একটি 'ওসিয়া' বা 'রসিক' চরিত্র থাকে। অনেকটা সংস্কৃত নাটকের বিদূষক বা ভাঁড়ের মতো। এই রসিক অনেক সময় সূত্রধারের মতো কাজ করে থাকে।

তার মানে এই নয় যে, এই-সব পালাগানগুলির উপর সংস্কৃত নাটকের প্রভাব রয়েছে। যদিও জনৈক বিশিষ্ট গবেষক মনে করেন যে সংস্কৃত বা শাস্ত্রীয় নাট্য থেকেই লোকায়ত নাট্যের জন্ম। শাস্ত্রীয় নাট্যগুলি এক সময় জনমানসের উপর এমন ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিল যা পরবর্তীকালে লোকায়ত সংস্কৃতিতে শিথিলভাবে আশ্রয় লাভ করে। *এ-সব যুক্তি কতটা গ্রহণীয় তা বিচারসাপেক্ষ। কেননা সামাজিক সাংস্কৃতিক শোষণের ধারাবাহিক ইতিহাসের পর্যালোচনায় এ কথা ক্রমশ পরিস্ফুট হয়ে উঠছে যে লোকায়ত সংস্কৃতি হল আদি সংস্কৃতি। বহিরাগত শোষক সম্প্রদায় সুকৌশলে সে-সব আত্মসাৎ করে প্রবল প্রচারযন্ত্রের সাহায্যে তা নিজস্ব ও উচ্চমানের বলে ঘোষণা করেছে। বিস্তৃত আলোচনায় এ বিষয়টি পরিস্ফুট করা সম্ভব। আপাতত সে-সব আলোচনা এখানে অবান্তর।

পশ্চিম দিনাজপুর জেলার খনের গান গ্রামীণ জীবনের কোনো কাণ্ড বা খণ্ডকে (কলঙ্কজনিত ঘটনা) কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। ঘটনা ও চরিত্রগুলি প্রায়শ অবিকল থাকে। এই গান একটি গ্রামে পরিবেশিত হলে ক্রমশ তা লোকমুখে গ্রামান্তরে ছড়িয়ে পড়ে। এখানেই তার অসামান্য লোকপ্রিয়তা। আমি দেখেছি, অধিকাংশ পালা তার উৎসভূমি হারিয়ে ফেলে একাকার হয়ে গেছে গ্রাম গ্রামান্তরে। ফলে, একই পালার বহু দল বিভিন্ন গ্রামে রয়েছে।

খনের একটি সামাজিক নৈতিক দিকও রয়েছে। খনের ঘটনা, যা সমাজ-অসমর্থিত, তা গানের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে গ্রামান্তরে। ফলত অবৈধ ক্রিয়ায় ভীতি জাগে সামাজিক মানুষের। এবং সম্ভবত এর প্রচারধর্মিতায় গ্রাম্য দেউনিয়া মাতব্বর শ্রেণীর লোক একে খুব ভালো চোখে দেখে না। আমি দেখেছি, এই-সব শ্রেণীর লোক এ-গানের আয়োজনে ও প্রচারে উৎসাহহীন ও বিরোধী।

খনের গানের সামাজিক নৈতিক বৈশিষ্ট্য যাই থাকুক-না কেন, এতে শিল্পগুণের প্রাধান্য সমধিক। এর গীতিরস ও নাট্যগুণ এমনই যে দর্শকের কাছে এর

---

*ফোক থিয়েটার অব ইণ্ডিয়া-বলবন্ত, গার্গী দ্রঃ

ঘটনা ও চরিত্রের বাস্তবতা বাহ্যবিষয় মাত্র। এর সুর ও অভিনয় এমনই হৃদয়-গ্রাহী ও জীবন্ত যে রসিক দর্শক তা ভুলতে পারে না সহজে। যার ফলে, সে নিজগ্রামে ফিরে গিয়ে হুবহু ওই পালার একটি দল তালিম দিয়ে তৈয়ারী করে এবং অভিনয়ানুষ্ঠানের আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। সুতরাং এই গানের পালাগুলিতে অসামাজিক ঘটনার প্রতি যে ধিক্কার নিহিত তা পরিশেষে করুণ মধুর রসে পরিসিক্ত হয়ে যায়। সমস্ত ক্লেদ ও ব্যভিচার সেই রসপ্রতিষ্ঠায় পুণ্যতোয়া হয়ে ওঠে। সেই রসে অবগাহন করে দর্শক এমনই মাতোয়ারা যে তার দৈনন্দিন কঠিন শ্রমের কাজে কখন জানি বুকের মধ্যে গুনগুনিয়ে ওঠে খনের কোনো আবেগমধুর অংশ। সে তখন উথাল হাওয়ায় গলা ছেড়ে দেয়।

এছাড়া, হাট-ফিরতি নিঃসঙ্গ পথিক তার নিঃসঙ্গতা ভুলতে সঙ্গী করে খনের সুর। তাই, এ গানের বিষয়বস্তুতে যে কৃষকজীবনের যে নীতি-নৈতিকতার কথাই থাকুক না কেন, এ গান কৃষকের হৃদয়ের গভীরে সুপ্রোথিত।

এ গানে নায়িকা প্রধান। তাই, বুলোসরী, বুধোসরী, নয়ানসরী, বর্মেসরী প্রভৃতি পালার নাম। 'সরী' বা 'শোরী কথাটির দুটি অর্থ। এক, বাচ্যার্থে নারীবোধক। দুই, লক্ষ্যার্থে, বৈধ জীবনযাপনে যে নারী চ্যুতা। নায়িকার অনুভূতি এতে বিশেষভাবে প্রকট হওয়ায় এই পালাগুলিতে লিরিক আবেদন স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

জলপাইগুড়ি জেলার পালাটিয়ার অন্তর্ভুক্ত 'খাস পাঁচালে' এই লিরিক অনুভূতির অভাব। সেখানে ঘটনাই প্রধান। ফলে, খনের মতো সে অঞ্চলের কৃষকের হৃদয়ে খাস পাঁচাল বাসা বাঁধতে পারে নি।

* * *

এক সময়ে সারা পৃথিবীতেই লোকায়ত নাট্যমঞ্চগুলি একই রকম ছিল। সমতলভূমি মঞ্চের তিন দিক ঘিরে দর্শক, একদিকে ছিল একফালি সরু পথ —কুশীলবদের সাজঘর থেকে মঞ্চ, মঞ্চ থেকে সাজঘরে ফিরে যাবার জন্য। জাপানে 'কাবুকি' নাটকের এই ছিল মঞ্চরূপ। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশেও অনুরূপ মঞ্চের ছিল ব্যবহার। কিন্তু ক্রমশ যখন সমাজে ওপর তলার সংস্কৃতি নীচুতলার সংস্কৃতির মধ্যে অনুপ্রবেশ করে পুঁজি বাড়াবার চেষ্টা করল তখন নাটকই হল প্রথম বলি। বলাই বাহুল্য, নাট্যই আদি শিল্প। ফলে, মঞ্চ

জনগণ থেকে ধীরে ধীরে স্বাতন্ত্র্য অর্জন করতে শুরু করল। নির্মিত হল উঁচু প্ল্যাটফরম। এখন বাংলার জনপ্রিয় 'যাত্রা' এবং ভারতের প্রায় সব প্রদেশেই লোকনাটকে উঁচু প্ল্যাটফরম ব্যবহৃত।

পালার বিষয়গুলি প্রায় সব প্রদেশেই পৌরাণিক বা দৈবীকাহিনীভিত্তিক। কর্ণাটকের লোকপ্রিয় যক্ষগণ, মহরাষ্ট্রের 'তামাশা', উত্তর ভারতের বিখ্যাত রামলীলা, রাসলীলা, গুজরাটের ভবাই (ভওয়াই), প্রভৃতির ভিত্তি ভারতীয় পুরাণ। সারা ভারতে কৃষ্ণকথা যে কী প্রবল প্রিয়তা অর্জন করেছে তা, বাংলার, কৃষ্ণযাত্রা থেকে মহারাষ্ট্রের তামাশা, উত্তর ভারতের ভগৎ, দক্ষিণের লবকুশ নাটকগুলির কাহিনী কিংবা মঞ্চপ্রয়োগে নিহিত। এ-সবের একমাত্র ব্যতিক্রম পাঞ্জাবের 'নকল', কাশ্মীরের 'ভন্দ জস্না' কিংবা উত্তর ভারতের নৌটংকি এবং উত্তর-বাংলার খনের গান। পাঞ্জাবের নকল, কাশ্মীরের ভন্দ জস্নার সঙ্গে উত্তরবাংলার কৌতুক নক্শা-নাটক 'ব' খেলার সবিশেষ মিল রয়েছে। উত্তর ভারতের নৌটংকির সঙ্গে যেন জলপাইগুড়ি অঞ্চলের মান পাঁচালের একটা সাদৃশ্য পাওয়া যায়।

কিন্তু লোকায়ত মঞ্চ ব্যবহারে উত্তর বাংলায় এখনো সেই আদি রূপ পরিলক্ষিত হয়। অথচ নাট্যপ্রয়োগে বাদ্যযন্ত্র ইত্যাদিতে হারমোনিয়ম তবলা বেশ জুড়ে বসেছে। কোথাও কোথাও বেহালাও 'বেয়ালা' রূপে স্থান পেয়েছে। পোশাক-আশাকের মধ্যে সমকালীন সমাজজীবনের ছাপও সুস্পষ্ট। স্থানীয় ও গোষ্ঠীগত স্বাতন্ত্র্য থাকলেও উত্তরবাংলার লোকযাত্রাগুলির সঙ্গে সারা ভারতের স্বারূপ্য মেলে। যেমন, বাদ্যযন্ত্রের ক্ষেত্রে মঞ্জুরা এবং চরিত্রাভিনয়ে ভাঁড় —এই দুই-এর ব্যবহার সর্বত্রই রয়েছে। গুজরাটের ভবাইর সঙ্গে উত্তরবাংলার খনের গানের একটি বিস্ময়কর স্বারূপ্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। মঞ্চে যখন কোনো অভিনেতার কোনো অভিনয় বা সংলাপ থাকে না, তখন সে মঞ্চের কেন্দ্রস্থলে বাদ্যযন্ত্রীদলের মধ্যে আসন নিয়ে কখনো দোহার হিসেবে কোরাসে যোগ দেয়, কখনো বা পড়ে-থাকা কোনো যন্ত্র তুলে নিয়ে বাজাতে থাকে। আবার, অভিনয়ের প্রয়োজন পড়লে লাফিয়ে উঠে তার দায়িত্ব পালন করে। এ-ভাবেই উত্তরবাংলার লোকযাত্রা সারা ভারতের লোকযাত্রার অংশী হয়ে পড়ে।

লৌকিক দেব-দেবী। পশ্চিম দিনাজপুব জেলায় দেবতাদের তুলনায় দেবীদের প্রাধান্য বেশি। এ জেলার জনজীবনে বহু প্রাচীনকাল থেকে যারা যুক্ত, তাবা সম্প্রদায়গতভাবে পলিয়া ও দেশী বলে পরিচিত। এদের সামাজিক জীবনে একদা হয়তো পুরুষদের তুলনায় মেয়েদের প্রাধান্য ছিল অধিকতর।

আজও সমাজ জীবনেব খুঁটিনাটি দিকে লক্ষ্য করলে এই প্রাধান্য দুর্লক্ষ নয়। বিশেষভাবে এই সমাজে প্রচলিত লোকগীতিগুলির মধ্যে এই পবিচয় নিহিত।

এ জেলার গ্রামে গ্রামে বুড়ী মা, বসন্ত ঠাকুরণ, বুড়াকালী, সর্পকালী, মশানকালী স্বমহিমায় বিরাজিতা। তাঁদের অসংখ্য থানে বিভিন্ন তিথি (লৌকিক) উপলক্ষে সাড়ম্বরে পূজা অনুষ্ঠিত হয়।

তাই বলে দেবতাদের সংখ্যাও অল্প নয়। কিন্তু দেবীরা দেবতাদের তুলনায় সংখ্যায় অনেক বেশি এবং কালের বিচারে বেশ প্রাচীন। দেব-দেবীদের নাম পরিচয় নিলেই একথা বোঝা যাবে।

এই জেলার সাংস্কৃতিক পরিচয়ে এই সাক্ষ্য মেলে যে নানা ইতিহাসের স্রোত বয়ে গেছে এর উপর দিয়ে। তারই প্রভাব দেবদেবীদের উপর পড়া স্বাভাবিক। বিশেষভাবে দেখা যায় দেবদেবীদের পাশেই স্থান পেয়েছে—

সংখ্যাতীত পীর। যেমন মুশকিল আসান পীর, মুকত্নম পীর তাজবাজপীর, একিন পীর, বুড়া পীর, জেঠা পীর, চেল পীর, বার পীর প্রভৃতি। এইসব পীরের দ্বারা এই অঞ্চলের হিন্দু মুসলমান উভয়েরই জন-জীবন অনেকখানি নিয়ন্ত্রিত ও নির্দিষ্ট। এই পীরের অনেক সেবায়েত মুসলমান পর্যন্ত নন। দেশী অথবা পলিয়া সম্প্রদায়ের কেউ।

পীরের কাছে মানৎ করে অভীষ্ট লাভ হলে ভক্ত পীরের দরগায় দেন সিন্নি মাটির ঘোড়া। ঘোড়া মানাটাই চল বেশি। অধিকাংশ পীরেব থান গাছের নীচে। এ জেলার ধলদিঘির পীর খুবই বিখ্যাত। প্রতি বৎসর মাঘ মাসে ধলদিঘির পীরের উরস উৎসব হয়।

এবারে কয়েকটি দেবদেবীব পরিচয় দেওয়া যাক।

গঙ্গারামপুর থানার দেবীপুর গ্রামের খুব প্রাচীন এক লৌকিক দেবীর নাম বুড়ী মা। তিনি বয়সের ভারে ঝুঁকে পড়েছেন। তাঁর মাথার চুল পেকে শাদা হয়ে গেছে কিন্তু গায়ের রঙ অতসী ফুলের মত। বুড়ী মা ভক্তের সব দায়ভার নেন। এই দেবীর পুজা প্রায় তিনশ বছরের পুরানো। প্রাচীন বটগাছের নীচে জীর্ণ খড়ের চালের তলে তাঁর থান। এই থানের লাগোয়া দক্ষিণ দিকে একটি পুকুর। জ্যৈষ্ঠ মাসের কোন এক শুভ সোমবারে তাঁর পুজা শুরু হয়। আর এক সোমবারে হয় শেষ। পুজোয় পায়রা বলি অবশ্য প্রয়োজনীয় অঙ্গ। এর সেবয়েত স্থানীয় রাজবংশী সম্প্রদায়। পুজোর কদিন গ্রামেব কয়েকজন ভক্ত মুখোশ পরে নাচ ও গান করে বেড়ায়। এই পুজো উপলক্ষে গ্রামে একটি বড় মেলাও বসে।

এই জেলার বাগত্নয়ার গ্রামে বুড়িজাড়ি পাড়ায় আরও এক বুড়ি মার খোঁজ পাওয়া গেছে। তাঁর গায়ের রঙ সাদা। পুজার সময় হল দুপুর। এই দেবীর সেবায়েত পলিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত।

পতিরাম গ্রামের এক জাগ্রতা দেবীর নাম বসন্ত ঠাকুরণ। তাঁর কোন মূর্তি কল্পিত হয়নি। তাঁর থান একটি রক্তচন্দন গাছের নীচে। সেখানে একটি পাথর খণ্ডকে বসন্ত ঠাকুরণ রূপে পূজা করা হয়। এই পুজো প্রায় দেড়শ বছরের পুরোনো বলে স্থানীয় লোকের ধারনা। তপন থানার অভিরামপুর গ্রামে চৈত্র সংক্রান্তির দিন বুড়া কালীর পুজো খুবই আকর্ষণীয়। এখন

খানিকটা শাস্ত্রীয় মূর্তির ধাঁচে বুড়াকালীর মূর্তি তৈরি হয়। কিন্তু স্থানীয় বৃদ্ধদের মতে মন্দির প্রতিষ্ঠার আগে বুড়া কালীব কোন মূর্তি ছিল না। প্রাচীন বটগাছের নীচে কালো পাথরটিকে বুড়াকালী রূপে পূজা করা হত। এই থানার তিলিঘাটা গ্রামে চৈত্র সংক্রান্তির সাতদিন আগে থেকে গম্ভীরা উৎসব আরম্ভ হয়। এই পূজা উৎসব প্রায় ২৫০ বছরের পুরোনো। এখানে দেবতা মশান ও দেবী ক্ষেত্রকালী। তাঁদের কোন মূর্তি নেই, তবে থান আছে। গম্ভীরা তলায় বাজনা বাজিয়ে দেব-দেবীদের জিযানো হয়। তাঁদেব জিয়োনোর দুদিন পরে খুব ভোবে ক্ষেত্রকালীর পূজো কবা বিধেয়। এইদিন দুপুর বেলা অন্য এক থানে বুড়াকালীর পূজা হয এবং পরেব দিন বাত্রে গম্ভীরা তলায শ্মশানকালীর পূজা প্রচলিত। এই পূজোব জন্য গ্রামের কযেকটি বাড়ি থেকে ঢেঁকি কুলো লাঙল লাঙলেব ফাল প্রভৃতি চুরি কবে দেবীর থানে নিয়ে আসতে হয়। রাত্রি জাগার পর ভক্তরা মশান অর্থাৎ মৃত মানুষের মাথা নিয়ে গ্রামের প্রত্যেক বাড়িতে নৃত্য কবে বেড়ান। এইদিন বিকেলে মশান তলায় মশান ঠাকুরের পূজো হয। লক্ষণীয যে দেবী তখন দেবতায পরিণত হযে গেছেন। এই পূজোর অন্য নাম ভাসান। এই পূজোয সকল গ্রামবাসী যোগ দেয়। তাঁদের মধ্যে সাঁওতাল ও ওঁরাও সম্প্রদাযের লোকেরাও আছেন।

কালিযাগঞ্জ থানাব মোস্তাফানগর গ্রামে এক দেবীর পূজো হয। তাঁর নাম সাপকালী। এই কালীর মূর্তিতে শাস্ত্রীয কালীর ছাপ আছে। কিন্তু তাঁর পদতলে শিবের বদলে সফণী সাপ। এই রকম সাপকালীর আরো খবর পাওয়া গেছে জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার জেলায।

এবার কয়েকজন দেবতার পরিচয় নেওয়া যাক। প্রথমে নাম করি মহারাজ-ঠাকুরের। তিনি কোথাও দ্বিভুজ, কোথাও চতুর্ভুজ। দ্বিভুজ মূর্তিতে তিনি হাতির পিঠে উপবিষ্ট। এক হাতে তাঁর বজ্র, অন্য হাতে ধানের মঞ্জরী। চতুর্ভুজ মহারাজা বাঘের পিঠে আসীন। এই মহারাজা সকল দেবতার রাজা। তিনি হয়তো ইন্দ্রদেব। কোন গ্রামে অসুখ বিসুখ দেখা দিলেই মহারাজ পূজোর আয়োজন হয়। বলাবাহুল্য, এসব পূজোয় ব্রাহ্মণ পুরোহিত থাকে না। মাহাত বা ফকির বা দেশি মালাকার এর পুরোহিত। রায়গঞ্জ থানার ধুসমল গ্রামের এই পূজো বেশ প্রাচীন।

বংশীহারী থানার দৌলতপুর গ্রামের পরিচিত দেবতার নাম গ্রামবাবা। তিনি

দেখতে অনেকটা বিষ্ণুর মত। তবে তাঁর দুই হাত। প্রকাণ্ড গাছের নীচে লতা-পাতায় ঘেরা তাঁর থান। স্থানীয় অধিবাসীদের বিশ্বাস ইনি গ্রামের রক্ষক। তাঁর পুজো করলে গ্রামে চোর ডাকাত আসতে পারে না। গ্রামের যে কোন বাড়িতে গাভী প্রসব করলে, সেই গাভীর প্রথম দিনের দুধ দিয়ে গ্রামবাবাকে চান করাতে হয়। প্রথম সন্তান হলে তার চুল বাবার কাছে উৎসর্গ করাটাই বিধি।

ইসলামপুর মহকুমায় রহৎপুর গ্রামে চোর দেবতার পুজো প্রচলিত। কার্তিক মাসের অমাবস্যায় কালীপুজোর রাতে পূজাটির শুরু। এই দেবতার কোন মূর্তি নেই। ভক্তরা স্থানীয় মালাকারের কাছ থেকে শোলার বীভৎস মুখোশ তৈরি করে মুখে পরে। তারপর তারা বাড়ি বাড়ি ঘুরে অর্থ সংগ্রহ করে। পুজোর নৈবেদ্য আলোচাল, দুধ কলা গুড় ঘি প্রভৃতি আর বলি হল পায়রা।

বৈরহাট্টা গ্রামে কার্তিক মাসের শেষে বুড়ীকালীর পুজো হয়। কুলোর উপর তাঁর মুখ আঁকা। আবার কাঠের উপর খোদাই করে তার ওপর শোলার নকসা কেটে মুকুট বসিয়ে এবং শোলার জিহবা লাগিয়ে কয়েকটি মুখোশ তৈরি করে থান-তলায় রাখা হয়। এগুলি সবই বুড়ি কালী। এই বুড়িকালী বৈরহাট্টা গ্রাম ও তার পার্শ্ববর্তী সকল অঞ্চলের কল্যাণ সাধন করেন। এই কালী খুবই জাগ্রত বলে সকলের বিশ্বাস।

করঞ্জী গ্রামে ছাচিকা দেবীর পুজো হয় প্রতি বৎসর মাঘী পূর্ণিমার দিন সকালে। গ্রামের মানুষের ধারণা, এই দেবী রুষ্টা হলে গ্রামে আগুন লাগে। গ্রামের সব ঘর পুড়ে যায়। তাই এই দেবীর আরেক নাম ঘরপুড়ি দেবী।

এগুলি পঃ দিনাজপুর জেলার অসংখ্য দেবদেবীদের কয়েকটি নমুনা মাত্র। সজ্ঘবদ্ধভাবে ব্যাপক অনুসন্ধান করলে এই জেলার দেবদেবীদের বিচিত্র ইতি-হাসের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। গ্রামে গ্রামে মূর্তিহীন অনেক থান পড়ে আছে কিন্তু বিশেষ সময়ে সেই থানে স্থানীয় অধিবাসীরা পুজোয় মেতে ওঠেন। আর স্থানীয়ভাবে নির্মিত হয় দেব বা দেবী, তা কখনো মাটির, কখনো শোলার বা কাঠের।
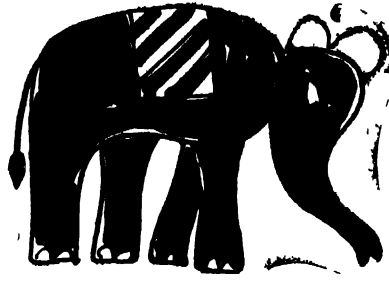
ধোকরা-ঝালং-বিছান। আপনি যদি পশ্চিম দিনাজপুর জেলার গ্রামে কোন দেশী সম্প্রদায়ের বাড়িতে কখনো গিয়ে উপস্থিত হন, তবে দেখবেন অতিথিবৎসল এই সম্প্রদায়ের বাড়ির লোকজন আপনাকে অভ্যর্থনা করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়বেন। বাইরে দাঁড়িয়ে আপনাকে কথা বলতে হবে না, তাঁরা সাদরে আপনাকে নিয়ে তুলবেন তাঁদের 'মাগুয়াঘরা' অর্থাৎ বৈঠকখানায়। আপনি ঘরে ঢুকে অবাক হয়ে যাবেন এরই মধ্যে তারা মাটির 'ধাপে' অথবা বাঁশের মাচার ফালায় (তকতোপোশ) বিছিয়ে দিয়েছেন সুদৃশ্য মোটা সতরঞ্জি ও চাদর। এখানকার গ্রামের ভাষায় ধোকরা-ঝালং অথবা বিছান।

ধোকরা এবং ঝালং পাটের তৈয়ারী। আর সুতোয় তৈয়ারী বিছান। আপনি মাগুয়াঘরায় প্রবেশের সময় লক্ষ্য করেন নি দাওয়ার দিকে। লক্ষ্য করলেও পাশাপাশি দুটো বাঁশের খুঁটি দেখে গুরুত্ব দেন নি কিছু। আসলে, ধোকরা ঝালং-বিছান বয়নের ওই দুটিই মূল যাদুদণ্ড। নাম তার তাঁতপোই। যদি একটু কৌতূহলী হন, তবে বাড়ির ভেতর গিয়ে দেখুন, একটু উঁকি মেরে শুতপা ঘরার (শোবার ঘর) ধাপে (দাওয়ার) তাকান, সেখানে নিশ্চয়ই তাঁতপোই জোড়া আছে এবং তাতে চড়ে আছে কোন ধোকরা ঝালং বা বিছানের কোন ফাটি। অথবা নিজেদের পরিধেয় দোসতি ছেওটা (বস্ত্র)। এই দোসতি ছেওটা মেয়েদের লজ্জা নিবারণ করে, বুক ঢাকে কোমর ঢাকে আজানু। তার নাম বুকানি বা 'কাপানি'। এরই এক ফাটি দিয়ে মেয়েরা সন্তান পিঠে বেঁধে নেয়। তার নাম ফাটিয়া। একেকটা তাঁতপোইতে মাত্র দেড় হাত চওড়া, সাড়ে চার হাত থেকে পাঁচ হাত লম্বা একটা ফাটি তৈয়ারী সম্ভব। দুই ফাটি জোড়া দিলে 'ছেওটা'। তিন ফাটি জোড়া দিলে তৈয়ারী হয়

একেকটা ধোকরা, ঝালং বা বিছান। এই তাঁতের শিল্পী দেশী সম্প্রদায়ের মেয়েরা। যদি তারা দৈহিক লম্বা হতো আরো কিছু বেশি, তবে ফাটি লম্বায় বাড়ত তদনুযায়ী। এই ফাটি দিয়ে তৈয়ারী হয় এ অঞ্চলের হাতঝোলা, কাঁধঝোলা। বলা যেতে পাকে এর নাম দিনাজপুরী ঝোলা।

এখন সুতোকলের কল্যাণে ঘরের ধাপিতে তাঁতপোইতে চড়ছে নানা ফাটি। গায়ের জন্য চাদর। পরনের জন্য দোসতি ছেওটা। কাচুয়া ছুয়া (বাচ্চা ছেলে-মেয়ে) পিঠে বাঁধার জন্য ফাটিয়া আর ফালার (তকতোপোশ) জন্য বিছান। সুতো কলের সুতো কেন, তুলোজাত কোন সুতোই আগে এ অঞ্চলে আমদানী হত না। তখন চলত কি করে ? কেন, জমিনে হেঁউতি (হৈমন্তী) পাটা আছে না! তার গা থেকে সযত্নে ছাল বা খোয়া ছাড়িয়ে নেওয়া হত। তাই দিয়ে তাকুবের সাহায্যে তৈয়ারী হতো যে পাটা সুতো, সেই সুতো চড়তো তাঁতপোইতে। বেরিয়ে আসত পাটের সুতোর ফাটিয়া দোসতি ছেওটা, আর ধোকরা।

পরে, হেঁউতি পাটার অভাব হল ; এল, নানা বিদেশী পাটা। আর সেই সঙ্গে এল হাট-গঞ্জে কলের সুতো। তখনো ফাল্গুনে শিমূলগাছ লালে লাল আর চৈত্র গাঁয়ের মাঠ পথ সাদা করে ঝরতো শিমূল তুলো। সেকালে কেউ এর দিকে ফিরে চায়নি। একালেও তেমন নয়।

পাটার ছাল থেকে সুতো তৈয়ারীর সেই সাবেকী পদ্ধতিটা একালেও রয়ে গেছে। রয়ে গেছে তাঁতপোই থেকে ধোকরা ঝালং, বিছানের অপূর্ব বয়ন-কৌশল। এই কৌশল শিক্ষিত বহিরাগতদের কাছেও খুবই কৌতুহলজনক। স্বাধীনতার পরে এক জেলাশাসক ও তাঁর স্ত্রী টুঙ্গুল গ্রামের হরেন দেবশর্মার মা কান্দেরী দেবীর কাছে জানতে চাইলেন এর বয়ন পদ্ধতি। জেলাশাসকপত্নী বালুরঘাটে তাঁর বাংলোয় নিয়ে রাখলেন কয়েক মাস কান্দেরী দেবীকে, কিন্তু শত চেষ্টায় নাকি জেলাশাসকপত্নীর আয়ত্তে এল না সে পদ্ধতি। বৃদ্ধা কান্দেরী দেবশর্মার গর্ব সেখানেই।

জলে ভেজা পাট থেকে ছাল ছাড়িয়ে ছালের আঁশ বা এদের ভাষায় খোয়া-গুলোকে এমনভাবে চিরে চিরে লাছি তৈয়ারী করতে হয়, ঠিক যেভাবে মেয়েরা চুলের জটা ছাড়িয়ে খোঁপা বাঁধে আলগোছে। পাটের গোড়ার দিকে আঁশ-গুলোকে বলা হয় ফোতো। আর মাথার দিকের খোয়া বা আঁশকে বলে পাইন। স্বাভাবিকভাবেই, গোড়ার দিকে ফোতো হয় মোটা। ফলে এর

স্থতো হয় মোটা। আর পাইন-এর খোয়া হয় সরু। সব খোয়ার লাছি (নছো) থেকেই তাকুরের সাহায্যে তৈয়ারী হয় স্থতো। লাছি বা বড় জোর স্থতো তৈয়ারী পর্যন্ত পুরুষের কাজ। কিন্তু তাঁতপোইতে তাঁত বোনা একমাত্র মেয়েদেরই ব্যাপার। পুরুষের ধোকড়া বোনা নিষিদ্ধ।*

ঝালং বোনার জন্য প্রয়োজন হয় রঙীন সরু স্থতো আর ধোকরার জন্য মোটা। ঝালং হবে রঙীন, আর বাহারী নকসায় ভরপুর। ধোকরা পাটের মূল রঙ নিয়েই তৈয়ারী। সাদামাটা। তাই মোটা ধোকরা গ্রামের মানুষেরা পেতে দেন কঠিন মেঝেতে অথবা বাঁশের মাচার তকতোপোশে। উঠোনে বিছিয়ে শুকুতে দেন ধান কলাই নানা শস্য। এমন কি ধোকবার বস্তায় তারা ধান গম কলাই লঙ্কা হাটে নিয়ে যান বেচতে। তাছাড়া, মোটা ধোকরা গরীব মানুষের দারুণ 'জাব' বা শীতের বন্ধু। তাই, ধোকরার ব্যবহার তাদের কাছে শখ শৌখিনতার নয়, নিত্য প্রয়োজনীয়। কিন্তু, রঙীন সোহাগী ঝালং বা বিছানের ব্যবহার কালেভদ্রে—অতিথি আপ্যায়নে, বিয়ে-পার্বনে। ঝালং বোনা শ্রম ও ব্যয়সাধ্য। তাই, এর বয়ন হাত গুণতি। ইদানীং হাটে হাটে রঙীন ধোকবা উঠছে। শহুবে শিক্ষিত জনের হাতে রঙীন ধোকরা একবাব এলে, সে তার কদর না করে পারে না। তার প্রধান কারণ, স্থতো তৈয়াবী থেকে বোনার গুণে এই ধোকরা তেমন খসখসে নয়—বরং মোলায়েম আর অাঁটোসাঁটো, টেকসই। যত্ন করে রাখতে পারলে ১০।১৫ বছরেও এর গুণ নষ্ট হয়না। তাছাড়া, নকসাকাটা রঙীন হওয়ায় দেখতেও বেশ আর দামেও শস্তা।

এক সময় এই স্থতো রাঙানোর জন্য বয়নকারিণী মেয়েরা বাজারের রঙের ওপর

* এ অঞ্চলে প্রচলিত একটি প্রবাদ থেকে জানা যায় যে যদি কোনো পুরুষ ধোকরা বোনে তবে সে তার পুরুষত্ব হারায়। এর মধ্যে সম্ভবতঃ একটা তাৎপর্য আছে। দেশী সম্প্রদায় আদিতে মাতৃশাসিত সমাজের অন্তর্গত ছিল। কিন্তু, আজ আর তা নয়। তবু, এই সম্প্রদায়ের মেয়েরা এখনো বেশ কিছু স্বাধীনতা বজায় রেখেছেন। তাঁরা ছাগল হাঁস প্রভৃতি জীবজন্তু পালন ও বিক্রি করেন। সর্বোপরি ধোকরা বুনে ও তা নিজেরা হাটে হাটে বিক্রি করে তাঁরা সামান্য কিছু আর্থিক স্বাধীনতা এখনো রক্ষা করে চলেছেন। সম্ভবতঃ ওই প্রবাদটি তাদের এই আর্থিক স্বাধীনতার রক্ষাকবচ।

নির্ভর করতেন না। গ্রামেই আছে বসত বৈর, জিয়া বা আমের গাছ। জিয়া ফল থেকে এরা নেন লাল, বসতবৈর থেকে খয়েরী, আর আমের কুসি থেকে কালো। ভালোভাবে সেদ্ধ করলেই এসব রঙগুলো বেরিয়ে আসে। এ রঙ সহজে ওঠে না। এখন কে করে অত পরিশ্রম। কাজ-কামও গেছে বেড়ে আর পয়সা ফেললেই হাতের কাছে মেলে হরেক রঙ।

সাড়ে চার হাত চওড়া আর পাঁচ হাত লম্বা রঙীন ধোকরা হাটে হাটে বিকোয় বারো থেকে আঠারো টাকার মধ্যে।* ঝালং ক্বচিৎ, কদাচিৎ মেলে। পাটের দাম চড়লে, ধোকরার দামও হয় চড়া। আড়াই সের পাট লাগে তিন ফাটির একটি ধোকারায়। ১৯৭৭ সালে গেছে পাটের মন একশ টাকা। তাহলে, হিসেবে দাঁড়ায় ছ'টাকা পঁচিশ পয়সার পাট লাগে একটি তিন ফাটির ধোকরায়। অথচ, নামমাত্র মজুরী যুকত হয়ে হাটে বিক্রী হয় তা। এর বয়ন-পদ্ধতি এবং তার শ্রম বিচাব কবলে অবাক হতে হয় শ্রমের তুলনায় মজুরী এখনো কত কম এদের কাছে।

সারাদিন খেটে বড়জোর একটি পূর্ণাঙ্গ ধোকরার সাড়ে চার হাত-পাঁচ হাত মাত্র ভুটি ফাটি বোনা যায়। তারপব জোড়াবান্ধা এ সব আছে। ঝালং এর এক ফাটি বুনতেই লেগে যাবে সারাদিন। এত পরিশ্রমের মূল্য দেবে কে ? তাই, ঝালং বোনা হয় না বড়। এগুলো সবই মেয়েরা বোনেন. হাটে হাটে বিক্রী করেন তাঁরাই। গ্রামে গ্রামে ঘুরে দেখেছি, ধোকারা, ঝালং বিছান মেয়েদের অবসর বিনোদনের কর্ম। যেমন শহুরে শিক্ষিতা মেয়েরা বোনেন উলের সোয়েটার।

পশ্চিম দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জ মহকুমার হাটগুলিতে ধোকরা ঝালং বিছান পাওয়া যায় বেশি। যেমন বংশীহারী থানার সরাই, ইটাহার থানার পতিরাজ আর কালিয়াগঞ্জের ধনকৈল। এই অঞ্চলের গ্রামগুলিতে আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সুযোগে দেখেছি ধোকরা ঝালং বিছান তৈয়ারীর কৌতু-হলোদ্দীপক পদ্ধতি।

ভুটি বাঁশের খুঁটি ধাপের (বারান্দায়) উপর ভু হাত ব্যবধানে পাশাপাশি মাটিতে পোঁতা। ওই খুঁটি ভুটির সঙ্গে একটা বাঁশ মাটির সঙ্গে সমান্তরালভাবে

বাঁধা। তার নাম তাছলা। তার থাকবে একটি উপর কাঠি, তার নীচে যে বাঁশের কাঠি থাকবে বাঁধা তার নাম দণ্ডর কাঠি। এবার নীচে পরপর যে কাঠিগুলো থাকবে সেগুলোর নাম যথাক্রমে জলোকাঠি, পিপড়ি কাঠি, কপনি কাঠি। এগুলো সবই বাঁধা থাকবে টানা সুতোর ভাঁজে ভাঁজে।

প্রথমে সুতো টানা পড়বে কপনি কাঠির সঙ্গে। কপনি আবার টানা থাকবে ছোট ছোট দুই খোটা দিয়ে। এরই নাম টানো। তাকুর থেকে সুতো যখন মাকুতে যাবে তখন তার নাম কাণ্ডা। এইসব অংশের সাহায্যে ধীরে ধীরে গড়ে তুলতে হবে দেড় হাত চওড়া আর পাঁচ হাত নাম্বা (লম্বা) ফাটি, যখন চ্যাওড়া (চওড়া) হবে ফাটি, তখন তার নাম হবে পেটোয়ান। পেটোয়ানের সময় যত নকসার কাজ। টানো হবে মোটা সুতোয় আর পেটোয়ানের হবে সরু। মোটা সুতো গেঁথে নিতে গেলে একটা আলগা মোটা ও চওড়া লাঠি দরকার। তার একধার অর্ধচন্দ্রকার। তার নাম বেওন। আর সরু সুতো গাঁথার সময় দরকার সরু কাঠি। তার নাম অলানি। নানা কাঠির ফাঁকে ফাঁকে টানা সুতোর সময় বেওন দিয়ে বোনা-গাঁথা শকত করে তুলতে হয়। অলানি দিয়ে পেটোয়ান গাঁথা মজবুত করা প্রয়োজন। নয়তো সুতো কোথাও আলগা হয়ে থাকতে পারে। ফলে, শিথিল হয়ে পড়বে বোনা। বয়নকারিণী যে দড়ি দিয়ে (মোটা শকত ও ঘন জালেব মতো দেখতে) নিজের কোমরের পশ্চাৎ অংশ বেঁধে বোনার কাজ করেন তার নাম নেত্তুরং।

টানো সুতো প্রথমে তাছলাকে ঘিরে একভাগ উপরিকাঠির নীচে দিয়ে দণ্ডর কাঠির উপব দিয়ে জালোকাঠি আড়াআড়িভাবে ডিঙ্গিয়ে পিপড়ি কাঠির উপর দিয়ে দণ্ডর কাঠি জালো কাঠির নীচ দিয়ে যাবে। আরেকভাগ, উপরি কাঠির উপর দিয়ে দণ্ডর কাঠি জালো কাঠির নীচ দিয়ে যাবে। আরেক ভাগ, উপরি কাঠির উপর দিয়ে দণ্ডর কাঠি জালো কাঠির নীচ দিয়ে গিয়ে আড়াআড়িভাবে পিপড়ি কাঠির নীচ দিয়ে কপনি কাঠির উপর দিয়ে যাবে। এই জটিল টানা পোড়েনের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠবে দেড় হাত চওড়া আর পাঁচ হাত লম্বা একেকটা ফাটি। আর এই ফাটির তিনটি জুড়ে তৈয়ারী হবে পূর্ণাঙ্গ একটি ধোকরা।

চারুচন্দ্র সান্যাল তাঁর রাজবংশীস অব নর্থ বেঙ্গল গ্রন্থে অবশ্য ধোকরার বয়ন পদ্ধতির বিবরণ দিয়েছেন। কিন্তু সে বিবরণ যেহেতু শুধুমাত্র জলপাইগুড়ি অঞ্চলে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে লিখিত, তাই পশ্চিম দিনাজপুরে

অঞ্চলের সঙ্গে বহুবিধ পার্থক্য বিদ্যমান। মনে রাখাতে হবে, দেশী সম্প্রদায়ের সঙ্গে রাজবংশী সম্প্রদায়ের বিভিন্ন বিষয়ে নানা পার্থক্য আছে—যদিও হয়তো মূলে একই জনগোষ্ঠী থেকে উভয়ের জন্ম।

এই জেলার 'পলি' সম্প্রদায় নিজেরা খুব বেশি এই ধোকরা তৈয়ারী করেন না। দেশী সম্প্রদায়ের প্রত্যেকের বাড়িতে এই শিল্প চর্চা আছে। মূলতঃ নিজেদের প্রয়োজন মিটিয়ে বাড়তি রোজগারের আশায় মেয়েরা হাটে হাটে বিক্রী করতে নিয়ে আসেন। এবং এই ধোকরা বিক্রীর টাকা নিজেদেব কাছেই গচ্ছিত রাখেন। বাড়িব মেয়েরা এইগুলিব মাধ্যমে তাই আর্থিকক্ষেত্রে স্বয়ংভরও বটে। কিন্তু, দুঃখের বিষয় এমন একটি অসাধারণ শিল্প যা শুধুমাত্র দেখতে সুচারু নয়, কাজের উপযোগী টেঁকসই বটে তা প্রচারেব অভাবে এই জেলার কয়েকটি হাটেব মধ্যে সীমিত হয়ে আছে।

পুনশ্চ॥ এই 'ধোকবা' আমার নজরে প্রথম আসে ১৯৭০ সালে বাঘন গ্রাম (থানা কালিয়াগঞ্জ) নিবাসী পবিত্র দেব বাড়িতে। তাঁর মেয়ে আমার ছাত্রী বসুমতী এ সম্পর্কে কিছু তথ্য আমাকে জানায় ১৯২২ সালে। তারপরেই ধোকরা সম্পর্কে আমার আগ্রহ বাডে। এ জেলায় কলকাতা থেকে নানা সময়ে আগত পরিচিত কবি সাহিত্যিকদের ধোকরা উপহার দিয়েছি। কিন্তু ধোকরা প্রচার পায়নি। ১৯২২ সাল নাগাদ বুনিয়াদপুরে ধোকরা সমবায় সমিতি তৈয়ারি হয়। ডাঃ জয়নাল আবেদীনের চেষ্টায় খাদি গ্রামোদ্যোগে কিছু ধোকরা বিক্রীর জন্যে আসে। কিন্তু তা সত্বেও ধোকরা বহুল প্রচারিত হয়নি। ফলে, ধোকরার দাম উঠল না। ১৯২২ সালে, পতিরাজ হাটে রঙীন ধোকরা ঝালণ্ডের গড় দাম ১০ থেকে ১২ টাকা। ১৯২২ সালে ১১ থেকে ১৪ টাকা। ১৯২২ সালে ১১ থেকে ১৫ টাকা। ১৯২২ সালে ১২ থেকে ১৮ টাকা।

১৯২২-এর ডিসেম্বরে কলকাতায় জনমেলা ৭৮ এ কুশমণ্ডী থানার রুদ্রানগর গ্রামের অজিত সরকার, লক্ষ্মণ সরকার, দেবেন দেবশর্মা, মাস্তাবালা এবং দিনোর সাপাড়া গ্রামের মলিন সরকারকে দিয়ে 'পশ্চিম দিনাজপুরের হস্তশিল্প' নামে প্রধানতঃ ধোকরার একটি প্রদর্শনী ও বিক্রয়ের ব্যবস্থা করি। দূরদর্শন, আকাশবাণী এর প্রচারে এগিয়ে এলেন। বিশেষভাবে দূরদর্শনে ধোকরাসহ শিল্পীদের সাক্ষাৎকার নিঃসন্দেহে এর প্রচারের ব্যাপারে স্মরণীয় ঘটনা।

এ-ব্যাপারে স্বপন রায়চৌধুরী, অলোক সেন, শর্মিষ্ঠা দাশগুপ্ত, পঙ্কজ সাহা,- সাংবাদিক প্রণবেশ চক্রবর্তীর অবদান অবিস্মরণীয়। যুগান্তর পত্রিকার সাংবাদিক অমিতাভ চক্রবর্তী, ভূমিলক্ষ্মী পত্রিকার সম্পাদক শান্তিকুমার মিত্র এবং বসুমতী পত্রিকার দেবব্রত ভট্টাচার্যও এর প্রচারে যথেষ্ট সহায়তা দিয়েছেন। কিন্তু ধোকরা শিল্পীদের তখনও কেউ সংঘবদ্ধ করেন নি। তাই কিছু প্রচার পেলেও সেই সময় বিদেশের বাজার পাবার সুযোগ হাতের কাছে এসেও নষ্ট হয়েছে। পরবর্তী সময়ে পশ্চিম দিনাজপুর জেলা শিল্পকেন্দ্রকে ধোকরা বিষয়ে আগ্রহী হতে দেখা গেল। ধীরে ধীরে গ্রাম পঞ্চায়েত, বিশেষতঃ কালিয়াগঞ্জ পঞ্চায়েত, সমিতি স্টেট ব্যাঙ্ক ইত্যাদির মাধ্যমে ধোকরা শিল্পীরা সঙ্ঘবদ্ধ হ'তে শুরু করেছেন। রাজ্য সরকার ধোকরা শিল্প বিকাশে ও প্রসারে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে এসেছেন। "উত্তরবঙ্গ লোকযান" তার সীমিত সাধ্যে ধোকরার প্রচার ও বাজার সৃষ্টির কাজ করে চলেছেন। ১৯২২ সালের রাজ্যকারুশিল্প প্রতিযোগিতায় ধোকরা কার্পেট হিসেবে দ্বিতীয়স্থান অধিকার করেছে। তবুও ১৯২২ সালের মার্চ মাসে পতিরাজ ও সরাই হাটে একটি উৎকৃষ্ট বড় ধোকরার দাম মাত্র ২২ টাকা।

কুনোর হাট পাড়ার মৃৎশিল্পী॥ গাঁয়ের নাম কুনোর হাটপাড়া। জেলা পশ্চিম দিনাজপুর। থানা কালিয়াগঞ্জ। এই গাঁয়েই বসতি নাইলু রায়, লক্ষ্মীকান্ত রায়, হেমেন রায়, গণেশ রায়, কাল্টু রায় প্রভৃতি মৃৎশিল্পীদের। এরা উত্তরবঙ্গের প্রাচীন পলিয়া জনজাতির অন্তর্ভুক্ত। বর্তমানে তফসিলী।

হাটপাড়ার ১৬ ঘর বাসিন্দারা হাটে হাটে ঘুরে তাদের সাবেকরীতির তৈরি মাটির জিনিসপত্র বিক্রি করে। এটাই তাদের প্রধান জীবিকা। সম্ভবত সেই কারণেই সড়কের ধারে এই গাঁয়ের নাম কুনোর হাটপাড়া।
সেই কবে থেকে পুরুষ পরম্পরায় ওরা মেয়ে-পুরুষে এখানে বাস করছে তা তারা জানে না। শুধু জানে বাপ, ঠাকুরদারও আগেকার বহুদিনের এই বাস, এই কাজ। মাটি ছেনে চাকে-পনিতে চড়িয়ে গড়ে তুলছে হাঁড়ি, পাতিল, মাটির নানা ভাঁড। সেই সঙ্গে গডে তুলছে পীরের ঘোড়া, হাতি, তেল রাখার নানা আকারের পাত্র, ধূপদান, প্রদীপ প্রভৃতি। এসব জিনিসের প্রত্যেকটির আলাদা আলাদা নাম দিয়েছে তারা নিজের ভাষায়। যেমন, তেলের ভাঁড়ের দুই ধরণ। একটির নাম পেচি। অন্যটির নাম ঠেকি। পেচি অনেকটা কুঁজোর মতো দেখতে হলেও শিল্প সৌকর্যে অপূর্ব। সমস্তই পোড়া মাটির এবং তুষের ধোঁয়ায় তার কালো রূপ। ঠেকি দেখতে হাঁড়ির মতো। টেরাকোটার ছোঁয়া রয়েছে তাতে।

হাটপাড়ার ১৬ ঘর পলিয়া কুমোরদের অধিকাংশেরই প্রধান জীবিকাস্থল দু' মাইল দূরে কালিয়াগঞ্জের ধনকোল হাট। সপ্তাহান্তে প্রত্যেকের ২০/২২ টাকার জিনিস বিক্রি হয় সেখানে। সে হাটে ভিড় হয় প্রধানত সাধারণ

চাষীদের আর ব্যাপারীদের। সেখানে চাষীরা পীরের ঘোড়া কেনে মানত দেবার জন্য আর রান্নাঘরে তেল রাখার জন্য পেচি ঠেকি। বিয়ে বা পার্বণ হলে বিক্রি হয় সব জিনিসই দেদার। হাটপাড়ায় তখন আসে একটু উল্লাস। নয়তো অধিকাংশ হাটেই তারা মালপত্র বাঁকে ভর্তি করে নিয়ে যায় আর ফিরিয়ে নিয়ে আসে। তাই হাটপাড়ায় দারিদ্র্য নিত্যসঙ্গী।

অথচ শিল্পরসিকজনের নজরে পড়লে হাট-পাড়ার শিল্পীদের তৈরি পোড়া মাটির ঘোড়া, পেচি ঠেকি, ধুপদান, কূপী, ঘরে ঘরে শোভা পেত। শোভা পেত তাদের তৈরি আদিম রীতির পুতুলগুলি।

বৃদ্ধ গবেষক পবিত্র দে-ই সম্ভবত প্রথম এই শিল্পের গুরুত্ব অনুভব করেন।

আমার মনে পড়ে, বাঘন গাঁয়ে(থানা কালিয়াগঞ্জ) তাঁর বাড়িতে আজ থেকে বছর বারো আগে এ অঞ্চলের লোক-শিল্প-সংস্কৃতি বিষয়ে কথা প্রসঙ্গে তিনি কুনোরের শিল্পীদের প্রশংসা করছিলেন। আমার আগ্রহ সেখানেই প্রথম জাগে। তাঁর মেয়ে বসুমতী দে ১৯২২ সালে সাহিত্যিক-সাংবাদিক সন্তোষকুমার ঘোষকে এক জোড়া পীরের ঘোড়া, তেলের পেচি-ঠেকি উপহার দেয়। সন্তোষকুমারের দামী ড্রইংরুমে রাশিয়ার লোকশিল্পের পাশে আজও তা দিব্যি শোভা পাচ্ছে।

১৯২২ সালে কলকাতার 'জনমেলায়' আমি কয়েকজন গ্রামবাসীর সহায়তায় এসব শিল্পসম্ভার সর্বপ্রথম উপস্থিত করি। সাংবাদিকদের নজর পড়ে। একজন তো বললেন, 'বাকুড়ার সতীন কলকাতায় এসেছে'। দূরদর্শনের মাধ্যমে কুনোর হাটপাড়ার শিল্পসম্ভার দেখানো হলো।

এরপর পশ্চিম দিনাজপুর জেলার শিল্পকেন্দ্রের প্রাক্তন জেনারেল ম্যানেজার সত্যেন মিত্র-র এদিকে নজর এলো। তিনি শিল্পীদের উৎসাহ দিতে শুরু করলেন। শিল্পসম্ভার বিশেষভাবে ঘোড়া, হাতি, পুতুল বরাত দিয়ে শিল্পকেন্দ্রে আনালেন। জেলা প্রতিযোগিতায় লক্ষ্মীকান্ত রায়, নাইলু রায় পুরস্কৃত হলো। গণতান্ত্রিক লেখকশিল্পী সঙ্ঘের জেলা সম্মেলনে কারুশিল্পের স্টল থেকে এসব জিনিস বিক্রি হলো। রবীন্দ্রভবন সম্পাদক অধ্যাপক জ্যোৎস্না কুমার সেন রবীন্দ্রনাথের এক জন্মদিনে কুনোর হাটপাড়ায় মৃৎশিল্পীদের সম্বর্ধনা দিয়ে সম্মান জানালেন। শিল্পীরা এতে উৎসাহিত সন্দেহ নেই, কিন্তু তাঁদের উৎসাহে জোয়ার আসে শিল্পদ্রব্য বিক্রি হ'লে।

বাজার এখনো সীমিত। প্রচার নেই কোনো। জেলা শিল্পকেন্দ্রের বিপনন ব্যবস্থা কমজোরী। একমাত্র উত্তরবঙ্গ লোকযান অনিয়মিত সীমিত ও বিপনন ব্যবস্থায় কলকাতার কয়েকটি মেলার মাধ্যমে কুনোর হাটপাড়ার যাবতীয় পোড়ামাটির শিল্পসম্ভার বিক্রি করেছে। ক্রাফটস কাউন্সিলের সম্পাদিকা রুবি পাল চৌধুরী, শিল্পী প্রভাস সেন এদের শিল্পদ্রব্যগুলোর সমাদর করেছেন। তাঁরা লণ্ডনের মেলায় এসব জিনিস বিক্রি করেছেন।

এই শিল্পীরা এখনো অসংগঠিত। অধিকাংশই নিরক্ষর এবং দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করেন। সরকারী সহায়তা ব্যাঙ্কের সাহায্য এসব পাওয়ার জন্য যে নেতৃত্ব দরকার এখনো সেসব তাঁদের ভাগ্যে জোটেনি। তাই তাঁদের ধনকোল ও আশেপাশের হাটের সীমাবদ্ধ চাহিদার উপর নির্ভর ক'রে এইসব জিনিস তৈয়ারী ক'রে যেতে হয়। অর্থাৎ সপ্তাহান্তে তাদের আয় এখন ২০ থেকে ৩০ টাকা।

কুনোর হাটপাড়ায় মাঝে মাঝে গিয়েছি। ধাপিতে বসে কাজ দেখেছি সাতো, ঢাকো নামের মহিলা শিল্পীদের। ওরা গুণ গুণ ক'রে গান গাইতে গাইতে তৈয়ারী করে দ্রুতহাতে মাটির চেরাগপ্রদীপ। ওদিকে লক্ষ্মী রায় রোদ্দুরে শুকুতে দেয় পীরের ঘোড়া। ওদের গাঁয়ে ঘরে ঘরে ঘুরে ঘুরে দেখেছি পনিতে চড়িয়ে কিভাবে তৈয়ারী ক'রে এসব। বাঁশের চাঁচি দিয়ে কি যাদুতে মসৃণ ক'রে টেরাকোটার সূক্ষ্ম আঁচড় দেয়, ধীরে ধীরে লাল অথবা চকচকে কালো রঙে সেজে মাটির জিনিসগুলো শিল্প হয়ে ওঠে!

নবান্নের সময় এক আঁটিও খড় দেখিনি ওদের কারো উঠোনে বা ঘরের চালে।

লক্ষ্মার হাটে জমিদারী॥ রায়গঞ্জ থেকে বালুরঘাটের পথে প্রতি সোমবার সবকটা বাস ভিড়ে ভিড়। ট্যাকসি, মিনি, লরি সবই এখানে এসে লোক উগরে দিচ্ছে। কালিয়াগঞ্জের সব দোকানই এদিন খোলা। মাছির মতো খদ্দের ভনভন করছে।

কাতারে কাতারে সব লোক বেল লাইন পেরিয়ে থানা ডানপাশে রেখে চলেছে। রিকসার রেট এদিন বেশি। সারি সারি গরুর গাড়ি পথের এপাশে ওপাশে। ট্রাফিক জ্যাম।

কুঠি যাছেন তমরা ?

কেনং। ধনকুল। আজ হাট ছে।

আশেপাশের গাঁয়ে ছেলেবুড়ো বাদে জোয়ান মর্দ বেটিছুয়া কারো দেখা পাওয়া ভার। চারপাশের সব গাঁ ঘর সোমবার মিলেছে ওই ধনকৈলে।

অমুক সরকারের দেখা পাওয়া দায়। সোমবার ধনকৈলে এসে খোঁজ করুন পেয়ে যাবেন। অমুক মাস্টারের বড়ো অসুখ, কদিন বিছানা ছেড়ে উঠতেই পারেন না। কিন্তু সোমবার তাঁর বাড়িতে যান, দেখবেন তাঁর বিছানা তোলা। তিনি টুকটুক করে হাটে এসেছেন।

কালিয়াগঞ্জে সোমবার সব ইস্কুল ছুটি। রবিবার খোলা। সরকারী অফিসও বন্ধ রাখতে পারলে ভাল হত। তবে, সে বন্ধেরই সামিল। লোকজনের দেখা পাওয়া ওইদিন বড়ো মুশকিল।

সোমবার মানেই কালিয়াগঞ্জের বাজার জমজমাট। ছোট্ট শহরটা লোকে লোকে ভরে যায়। মিটারগেজের রাধিকাপুর-বারসোইর ট্রেনে ওঠে কার সাধ্যি।

উত্তরবঙ্গের প্রখ্যাত হাট এই ধনকৈল। যেখানে এলে ধনশালী হওয়া যায়। নাম শুনে অনেকে ধারণা করেন এইরকম। কিংবদন্তীও সব তৈরি হয়েছে হরেক রকম। কে চিনত মশাই ওই শৈলেন সেনকে! বয়রাকালীর দুয়ারে হত্যা দিয়ে পড়েছিলেন। মায়ের আদেশে এলেন ধন-কুলের হাটে লঙ্কা কিনতে। লক্ষপতি হলেন তিনি দেখতে দেখতে।

ইস্কুলের ভূগোল বইতে লেখা কালিয়াগঞ্জের লঙ্কা বিখ্যাত। কে জানত মশাই ধনকৈল না থাকলে! থোড়াই কালিয়াগঞ্জের লঙ্কা বিখ্যাত! আসে তো সব কুশমণ্ডী এলাকা থেকে। ধনকৈল যে কালিয়াগঞ্জে। সেই গঞ্জটাও তো সাবেক-আমল থেকেই বেশ বড়সড়। হাট কালিয়াগঞ্জ বুকানন সায়েব তাঁর বইতেও উল্লেখ করে গেছেন। কিন্তু ধনকৈলের নাম তখন ছিল না। আসলে এই হাটখান তো হাল আমলের। হ্যাঁ, সাবেককালের হাটের নাম শুনতে চান! ওই তো ইটাহার থানার পতিরাজ। এখনও মরে যায়নি। যে-কোন রবিবার গিয়ে দেখুন। তেজী হাট। পাটের মরশুমে জে সি আই তার দলবল নিয়ে ওখানে পাট কেনার জন্যে ধরনা দিয়ে বসে থাকে ফি রবিবার।

পতিরাজ হাট ভূপালপুরের রায়চৌধুরীদের এক্তিয়ারে। আর ধনকৈল হাটে চারভাগের জমিদারী। রমেন্দ্রকৃষ্ণ, গোপেন্দ্রকৃষ্ণ রায় চৌধুরী, শান্তিলতা আর বীথিকা ভৌমিকের যথাক্রমে পৌণে পাঁচ আনা, পৌণে পাঁচ আনা, এক সিকি আর দশ পয়সার 'জমিদারী' বহাল তবিয়তে অটুট। সরকার একবার নাক গলাতে চেয়েছিলেন ওই জমিদারীতে। ধর্মাধিকরণের আদেশে তা নাকচ হয়। বাৎসরিক কোটি টাকার লেন-দেনের ক্ষেত্রে তোলার অধিকার অটুট।

'ছিরামতী' নদীর ধারে প্রতি সোমবার বসে এই হাট। প্রতি সোমবার হাজার হাজার টাকার লেনদেন চলে এখানে। বছরের হিসেবে প্রায় কোটি টাকা। কত ফকির এখানে বাদশা বনেছে, কিন্তু কোন বাদশা এখানে ফকির হয়েছে,

এমন খবর নেই (যদিও সাট্টা খেলার আসরের অভাব নেই এখানে)। তাই, এ হাট সার্থকনামা।

ফাল্গুন, চৈত্র, বৈশাখে—লালে লাল এই হাট, হাট-এলাকা। টকটকে লাল শুকনো লঙ্কার মরশুম। জ্যৈষ্ঠ থেকেই ভরে ভাটা। লাল ফিকে হতে থাকে। ওই তিনমাস লঙ্কার ঝাঁঝে বাতাস হয় ঝাঁজালো।

পেঁয়াজ পাটের মরশুমেও এ হাটের রবরবা। রবরবা ধান-কলাই অন্যান্য রবি-শস্যে। এই সঙ্গে বারোমাস বসে বিধিমতো গবাদি পশু, হাঁস, মুরগী, খাসি, পাঁঠা, ছাগল। সেইসঙ্গে বসে চামড়া, জুতো, মাটির হাঁড়ি কলসী, কড়াই, লোহা, কাঁসা, কাপড় চোপড় কি না।

বছরের বিক্রিবাট্টার হিসেব নেওয়া গেলে দেখা যাবে সারা বছর কেমন তেজী এই হাট। 'মন্দা' কথাটি যেন এর খাতায় লেখা নেই।

আর্থিক বছর হিসেবে বিগত ১৯৭৬-৭৭ সাল বিক্রি হয়েছে এই রকম—

ধান ১২ হাজার কুইণ্টাল। মূল্য : ১১,৪০,০০০ টাকা। পাট ৬,৯৪০ কুইণ্টাল। মূল্য : ১০,৪১,০০০ টাকা। লঙ্কা ৪,০৪০ কুইণ্টাল। মূল্য : ২৬,২৬,০০০ টাকা। পেঁয়াজ ১১৫০০ কুইণ্টাল। মূল্য : ৫,৭৫,০০০ টাকা। আলু ১০,০০০ কুইণ্টাল। মূল্য : ৬,৫০,০০০ টাকা।

এছাড়া গরু, মোষ, ছাগলের চামড়া যে পরিমাণ বিক্রি হয়েছে তার আর্থিক মূল্য প্রায় ১৯ লক্ষ টাকা। চল্লিশ হাজার গবাদি পশু বিক্রির মোট দাম প্রায় ১৫ লাখ টাকা। হাঁস, মুরগী, খাসি, ছাগল, পাঁঠা বিক্রি হয়েছে সাড়ে পাঁচ হাজার। এর আর্থিক মূল্য হল ২ লক্ষ ৮৬ হাজার টাকা। এ সবের মোট হিসেব করলে প্রায় কোটি টাকার পণ্য ৭৬-৭৭ সালে বিক্রি হয়েছে। এই হিসেবের মধ্যে শাড়ি-কাপড়-চোপড়, ডাল গম ইত্যাদি হরেক রকম পণ্য বাদ। সে সবের হিসেব নিলে আরো কয়েক লাখ টাকা এর সঙ্গে যুক্ত হতে পারে।

যাই হোক, এখন প্রশ্ন ওঠে—এসব পণ্য কি সরাসরি উৎপাদক প্রতি সপ্তাহে এ হাটে নিয়ে আসেন? তার জবাব হল, উৎপাদক চাষীরা কিছুপণ্য নিয়ে এলেও তা উল্লেখযোগ্য নয়। ফি-সোমবারের মধ্যে ধনকৈলকে ঘিরে আরো কতগুলি হাট সপ্তাহে একবার কি দুবার বসে। সেগুলিকে বলে ফিডার মার্কেট। সেই মার্কেট বা হাটগুলোর নাম হল কুশমণ্ডী, ফতেপুর, উষাহরণ, ডালিম গাঁ, রাধিকাপুর, কুনোর, সমাসপুর ধুকুরজারি প্রভৃতি। এই হাটগুলিতে যেসব

পণ্য উৎপাদকরা নিয়ে আসেন সেগুলি ছোট-মাঝারি পাইকারদের মাধ্যমে আসে ধনকৈলে। এই সব ছোট ছোট হাটে বড় বড় মহাজনদের লোকজনও ঘুরে বেড়ায়। সেই সঙ্গে আছে ফড়িয়াদের দল। তবে, ফড়িয়া মহাজন ধনকৈল হাটে একচ্ছত্র অধিপতি। তাদের হাতেই ধনকৈলের দাম কমা বাড়া নির্ভর করে। স্বাভাবিকভাবেই এদের কৌশলে চাষী মার খায়। ফড়িয়া বা দালাল এ হাটে আছে ৩৫০ জন। খুচরা বিক্রেতাদেব সংখ্যা ৮০০ জন। আর পাইকারের সংখ্যা মাত্র ৭ জন।

যে হাটে ফি সোমবার সহস্রাধিক মানুষের আনাগোনা এবং লক্ষাধিক টাকার লেনদেন চলে তার চেহারা দেখলে অবাক হতে হয়।

কালিয়াগঞ্জ বালুরঘাট পাকা সডক থেকে দুটি রাস্তা হাটে গিয়ে ঠেকেছে। একটি এবরো খেবরো ভাঙা ইঁটে সংক্ষিপ্ত পথ। অবশ্য তার মধ্যে আছে কাঠের ভাঙ্গা পুল। নীচ দিয়ে বয়ে গেছে শ্রীমতী না ছিরামতী নদী। একটু অসতর্ক হলেই পা গিয়ে পডবে ভাঙ্গা পুলের ফোকরে। অথবা নডবড়ে পুল থেকে আপনি সিধে পড়তে পারেন ছিরামতীর জলে।

সেই বিপজ্জনক পুল পার হয়ে বর্ষাকালে ভয়ানক পিচ্ছিল পথে দু'চারবার আছাড় খেতে খেতে আপনি পৌঁছুতে পারেন উত্তরবঙ্গের বিখ্যাত হাট ধনকৈলে।

হাটের পুব দিকে পথটি একটু ঘুর পথ। ট্রাক, জিপ, মায় গরু গাডির এটিই একমাত্র পথ। প্রায়শঃই ট্রাক, জিপ, গরু গাডিতে এ পথ অবরুদ্ধ। শীত কিংবা গ্রীষ্মকালের ধূলোয় গাড়ির চাকা বেশ খানিকটা ডুবে যায়। আর বর্ষাকালে ? সে এক অবর্ণনীয় অবস্থা।

হাটের ভেতরে দোচালাগুলি অবিন্যস্তভাবে সাজানো। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে নানারকম খোলা খাবার নিয়ে বসে আছে দোকানীরা। যেখানে সেখানে স্তূপীকৃত লঙ্কার মরশুমে লঙ্কা, পেঁয়াজের মরশুমে পেঁয়াজ বা পাটের মরশুমে পাট। ফলে, হাটের ভেতরে চলাচল এক দুরূহ ব্যাপার।

একটু বৃষ্টিতেই সেখানে এক হাঁটু কাদা। একটু বাতাসেই সেখানে ধুলোর ঝড়। তাই আপনি যখন সেখান থেকে ফিরে আসবেন কালিয়াগঞ্জে তখন যিনি আপনাকে দেখবেন, তিনি বলবেন, ধনকৈলে গিয়েছিলেন বুঝি দাদা ! যদি হাট ঘুরতে ঘুরতে আপনার জলতেষ্টা পায়, তবে হাঁ৷ একটা ভাঙ্গা

টিউবওয়েল আছে, পানীয় জল পাওয়া না পাওয়া আপনার কপাল।

আর যদি প্রাকৃতিক আহ্বান আসে? তা, আর কি করা যাবে বলুন, গ্রামের ব্যাপার মনে করে চোখ বুজে কাজ সারুন।

এসব দেখেশুনে আপনি যদি ক্ষুব্ধ হন, ভাবেন, সরকার কি দেখে শুনে কোন ব্যবস্থা নিতে পারেন না! আগেই বলেছি মাননীয় সরকার এখানে নাক গলাতে এসে কিছু করতে পারেন নি।

এবার আপনাকে কয়েকটি খবর জানাই। এক, এই হাট থেকে হাট মালিকদের যে আয় হয় বছরে, তারই ভিত্তিতে তাঁরা সরকারকে আয়কর দেন সাড়ে একুশ থেকে সাড়ে বাইশ হাজার টাকা। আর এই জমির খাজনা দেন ১,৮২৫ টাকা।

হাট পরিচালনা বাবদ ব্যয়ের বহর কিন্তু কম নয়। বছর হিসাবে ছত্রিশ হাজার চারশ টাকা। হাটের যে হাল দেখলেন তাতে ব্যয়ের খবর শুনে চমকে উঠলেন তো! এবার ফাইলবন্দী আরো খবর শুনুন। এখানে হাট কর্মী আছেন মোট ৬ জন। তাদের মধ্যে হাট পিছু একজনের বেতন ১৪ টাকা। ৩ জনের বেতন ৭ টাকা। ২ জনের বেতন ৩ টাকা হিসাবে। একজন কর্মচারীর বেতন ৫ টাকা। অর্থাৎ মাসে চারটে হাট পড়লে একজন কর্মচারীর রোজগার ৫৬ টাকা। বাকি কর্মচারীরা যথাক্রমে ২৮ টাকা, ১২ টাকা এবং ২০ টাকা রোজগার করে থাকেন। তোলা আদায়কারী হিসাবে কাজ করে থাকেন ৩৩ জন। এঁরা সবাই কমিশন ভিত্তিক কর্মচারী। ধান, লঙ্কা, মাছ-এর তোলার কমিশন ২৫% আর বাকিপণ্যের তোলা কমিশন হল ৩০%

সুতরাং সারা বছর যে কি করে হাট পরিচালনা বাবদ ৩৬ হাজার ৪০০ টাকা ব্যয় হতে পারে, সেটা নিয়মিত কোন হাটযাত্রীর বোধগম্য নয়।

এসব বিসদৃশ ব্যাপার এক সময়ে সরকারের নজরে এসেছিল এবং হাট উন্নয়ন পরিকল্পনা রচনা করার চেষ্টাও হয়েছিল। কিন্তু আইন আদালত ইত্যাদির কারণে সে পরিকল্পনা সরকারকে বাতিল করতে হয়েছে ধনকৈলের ক্ষেত্রে।

তবে বছর কয়েক হল পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি বিভাগ কালিয়াগঞ্জে নিয়ন্ত্রিত বাজার নামে একটি সংস্থা গড়ে তুলেছেন। যাদের কাজ হ'ল উৎপাদক

চাষীকে নানাভাবে সহায়তা দেওয়া। আপাততঃ এদের বড় কাজ প্রতি সোমবার ধনকৈল হাটে হানা দেওয়া। সেখানে উৎপাদক চাষীরা যাতে সুবিধাবাজ ব্যাপারীদের হাতে কোনক্রমেই হেনস্তা না হয় তা দেখা। কেননা, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অসাক্ষর বা স্বল্প সাক্ষর সহজ সরল চাষীদের উৎপাদিত পণ্য ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত হয়। নিয়ন্ত্রিত বাজারের কাজ প্রতারকদের হাত থেকে উৎপাদককে রক্ষা করা। এছাড়া চাষীর উৎপাদিত ফসল সংরক্ষণের ব্যবস্থা, উৎপাদকের প্রাপ্য মূল্যের সঙ্গে ভোক্তার দেয় মূল্যের ব্যবধান কমিয়ে আনা অর্থাৎ ফড়িয়া ব্যবস্থার উচ্ছেদ, চাষীকে অধিক ফসল ফলানোর উৎসাহ দেওয়া, হাটে পরিচ্ছন্ন স্বাস্থ্যকর পরিবেশ গড়ে তোলা, উন্নত পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু করা সর্বোপরি উৎপাদক ক্রেতা ও ভোক্তার মধ্যে একটা সুষম সম্পর্ক গড়ে তোলা। কালিয়াগঞ্জ নিয়ন্ত্রিত বাজারের বিশেষ লক্ষ্য।

ধনকৈল হাটে এই কিছুদিন আগেও সের বাটখারা চালু ছিল। নিয়ন্ত্রিত বাজার কর্মীরা ধনকৈল হাটে নিয়মিত গিয়ে মেট্রিক পদ্ধতিতে ওজনের ব্যবস্থা চালু করেন। সেখানে ওজনের বিরাট কারচুপি চলছিল। ফড়িয়ারা সরল চাষীদের পণ্য নিজেরাই ওজন করে কিনত। বাজার কর্মীরা উপস্থিত থেকে পণ্যের ন্যায্য মূল্য নির্ধারণ শুরু করেন এবং বিজ্ঞানসম্মতভাবে পরীক্ষিত ওজন ব্যবস্থা বসান। তাছাড়া হাট জমিদারের অযৌক্তিক তোলার মূল্য কমানোর জন্য বাজার কর্মীরা সচেষ্ট হয়েছেন। গোপন লেনদেন বন্ধ করে প্রকাশ্য নীলামে ক্রয়বিক্রয়ের জন্য চাপ সৃষ্টি করছেন।

তাছাড়া নিয়ন্ত্রিত বাজার স্বতন্ত্র একটি সুন্দর পরিকল্পনাও গ্রহণ করেছে। কৃষক, ব্যবসায়ী, ব্যাঙ্ক সরকারী প্রতিনিধি নিয়ে একটি শক্তিশালী বাজার পরিচালকমণ্ডলী তৈরি করা হয়েছে। নিয়ন্ত্রিত বাজার এখন প্রকাশ্য নিলামের একটি প্লাটফরম। কৃষিদ্রব্য সংরক্ষণযোগ্য উন্নত গুদাম ঘর ও হিমঘর নির্মাণের কাজ চলছে। কৃষি দ্রব্যাদির গুণগত ও পরিমাণগত শ্রেণী বিন্যাসের কাজ শুরু হয়েছে। নিয়ন্ত্রিত বাজার সমিতি আরও যে সব কাজ করছে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল, চাহিদা যোগান, মূল্য প্রভৃতি বিষয়ে সঠিক সংবাদ সরবরাহের জন্য একটি বিভাগ, সহজ পরিবহণ ও যোগাযোগ, গরু মোষ প্রভৃতি পশুর ব্যবহার্য পানীয় জল, শেড ও গাড়ি রাখার ব্যবস্থা। তদুপরি কালিয়া-

গঞ্জের দশ মাইলের মধ্যে 'চান্দোল' নামক জায়গায় নিয়ন্ত্রিত বাজারের একটি আদর্শ কেন্দ্র তৈরির কাজ শুরু হয়েছে।* কুশমণ্ডী, বংশীহারী থানা এলাকাও এই আদর্শ নিয়ন্ত্রিত বাজারের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। মূল কেন্দ্রকে ঘিরে কয়েকটি উপকেন্দ্র তৈরি করার পরিকল্পনা রয়েছে।

* ৫ বছর আগে এটি লিখিত। বর্তমানে নিয়ন্ত্রিত বাজার চালু হয়েছে কিন্তু এখনো জনপ্রিয়তা পায়নি। ফলে, ধনকৈলের জমিদারী অটুট।

কারুশিল্প॥ উত্তরবঙ্গের কারুশিল্প কি? এ প্রশ্নের চটপট জবাব আমাদেব অনেকের কাছেই তৈরী নেই। কেন না, উত্তরবঙ্গ এখনো আমাদের কাছে অনধিগম্য। এখনো উত্তরবঙ্গে বদলির আদেশ এলে মাথায় বজ্রপাত হয়। যদিও বঙ্গ একটাই—কিন্তু উত্তর দক্ষিণে দূরত্ব বিশাল। অন্ততঃ আমাদের অনেকের ধারণায়।

কর্মসূত্রে বাঁধা যাঁরা উত্তরবঙ্গে বাপ ঠাকুরদার আমলে থেকে, তাঁরাও যে কারুশিল্প বিষয়ক প্রশ্নের চটপট জবাব দেবেন, এমন নয়। সেখানকার-মাটি, জল-জঙ্গল এই সব বঙ্গবাসীদের অচেনা, অজানা। তাই, উত্তরবঙ্গের শুধু কারু-শিল্প কেন কোন শিল্প-সংস্কৃতির পরিচয় এঁদের অনেকের কাছ থেকে জানবার উপায় নেই। ব্যাক্তিগত শ্রমসাধ্য প্রয়াসে এইসব কৌতূহল মেটাতে হয়।

আসাম, সিকিম, নেপাল, বিহার আর বাঙ্গলাদেশ ঘেরা উত্তরবঙ্গে শত শত বন্যা, ভূমিকম্প, মহামারীতেও যারা নিশ্চিহ্ন হয়নি, যারা হাজার বছর ধরে তিস্তার বালি দিয়ে কেবলই ঘর গড়েছে, আকাশ-মাটি, জল-জঙ্গল আর বিস্তীর্ণ দামাল পাহাড় যাদের শিরায় শিরায় ধমনীতে হৃদয়ে তারাই উত্তরবঙ্গের কারুশিল্প-সংস্কৃতির স্রষ্টা।

শিল্পের জন্য শিল্প এখানে সৃষ্টি হয় না। শুধু এখানে কেন, কোথাও লোকশিল্প শুধু শিল্পের জন্য তৈরী এমন উদাহরণ বিরল। দার্জিলিং জেলার নেপালী, ভুটিয়া, গোর্খা, কোচবিহার-জলপাইগুড়ি জেলার কোচ রাজবংশী, মেচ,

কাছারী, রাভা, টোটো কিংবা পশ্চিম দিনাজপুর মালদহ জেলার দেশীয়া, পোলিয়া সকলেই প্রয়োজনের নিরিখে যে সব জিনিস তৈয়ারী করেন আমরা তাকেই বলি উত্তরবঙ্গের কারুশিল্প। এই বঙ্গের এঁরাই আদি নিবাসী।

কি তাদের প্রয়োজন? প্রয়োজন, লজ্জা নিবারণের কাপড়, শীতের হাত থেকে বাঁচার জন্য আচ্ছাদন। আত্মীয়-কুটুম এলে বসতে শুতে দেবার জন্য চাই কিছু। এইসব প্রয়োজনে পাটের সুতোর তৈয়ারী মেখরী, দোসতি ছ্যাওটা, ফাকচেক, কাম্বাং, ধোকড়া, ঝালং বিছান এসেছে। দেড় হাত 'চ্যাওড়া' পাঁচ হাত লাম্বা একটা ফাটি তৈয়ারী হয় বাঁশ দিয়ে বসানো একটি সহজ সরল দেশী তাঁতে। এই ফাটিগুলি প্রয়োজন মতো জুড়ে তৈয়ারী হয় ধোকড়া, ঝালং, বিছান।

এখন কলের সুতো ছড়িয়ে পড়েছে সর্ব্বত্র। সেই সুতো দিয়েই আকছাড় তৈয়ারী হচ্ছে পরিধেয় বস্ত্র ছ্যাওটা। সেই সুতোয় তৈরী হচ্ছে বিছানার চাদর বিছান, কাঁধের থলে এমন কি পিঠে ছেলে বাঁধার ফাটি।

ধোকড়া-ঝালং সাবেক কালের মতোই পাটের তৈরী। যদিও কোচবিহার জলপাইগুড়িতে বড় বড় মহাজনের দাপটে এসব খুঁজে পাওয়া ভার। তবুও পশ্চিম-দিনাজপুর মালদহে এখনো এইসব ধোকড়া-ঝালং তৈরী করছেন দেশীয়া রমণী যা আমরা শতরঞ্চী, কার্পেট হিসেবে ব্যবহার করতে পারি অনায়াসে।

কত দাম এইসব ধোকড়া-ঝালঙের। মজুরী হিসেব করলে এর দাম ঢের। কেননা দেড় হাত চওড়া, পাঁচ হাত লম্বা একটা ফাটির জন্য একদিনের হাডভাঙ্গা শ্রম তো যায়ই। তার আগে আছে পাটের ছাল ছাড়িয়ে সুতো তৈয়ারী খাটুনি। সেই সুতো রং করারও পরিশ্রম কম নয়। কিন্তু এসবের হিসেব কষেণ না কোন দেশীয়া রমণী। ছাগল চরানো, মাঠ-জঙ্গল থেকে জ্বালানী সংগ্রহ। রান্নাবান্না আর সোয়ামী, ভাই অথবা বাপকে জমিতে খাবার দেওয়ার কাজের ফাঁকে ফাঁকে এই সব তৈয়ারী করেন ওরা।

ধোকড়া-ঝালং ছাড়াও ওপার বাংলা আর বাদিয়া মুসলমানদের প্রভাবে এসেছে নক্সীকাঁথা। ঘরে ঘরে যে নক্সীকাঁথা তৈরী হয়, এমন নয়। কিন্তু তবু যে কটির সন্ধান পাওয়া যায় তার কাজও যথেষ্ট প্রশংসনীয়। ১৯২২ সালে পশ্চিমদিনাজপুর জেলার নক্সীকাঁথা রাজ্য সরকারের কারুশিল্প প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার লাভ করেছে। ওই কাঁথাটি নব্বই বছরের বৃদ্ধা শাশুড়ী তার জামাইকে উপহার দেবার জন্য চল্লিশ বছর ধরে বুনেছিলেন। আরেকটি

নক্সীকাঁথা সম্প্রতি আমাদের নজরে এনেছেন জেলা শিল্পকেন্দ্র। যার কারুকর্মও যথেষ্ট প্রশংসার দাবী রাখে।

পিঠে ছেলে বাঁধার জন্য দেশীয়া রমণী লাল নীল, সবুজ রঙের সুতোয় যে ফাটি তৈরী করেন তা আমাদের আরামকেদারার ছাউনি হিসাবে বেশ কাজে লাগে। এই ফাটি দামেও সস্তা অথচ টেঁকসই। মাত্র বারো তেরো টাকা এর দাম।*

জলপাইগুড়ি জেলার রাভা মেচ রমণীদের পরিধেয় বস্ত্রগুলি চমৎকার। শিল্প-নৈপুণ্যে ভরা। কিন্তু, এগুলোর কথা কজন জানেন, জানতে চান ?

এবার মুখোশের কথা। চৈত্র মাসে দক্ষিণে মহানন্দা পাড় থেকে উত্তরে গোটা তিস্তা উপত্যকায় শুরু হয় গমীরা উৎসব। এই উৎসব চলে আষাঢ় মাস পর্যন্ত। এই উৎসবে নাচের জন্য চাই কাঠের মুখোশ। মালদহে, জলপাই-গুড়িতে যার নাম মুখা, পশ্চিমদিনাজপুরে তারই নাম মোখা। ছাতিম নিম গামারী কাঠ দিয়ে তৈরী হয় এসব। আকারে লম্বায় এক হাত থেকে দু'হাত। পাশে আধ হাত থেকে এক হাত ; এই বিরাট সব মুখোশ পরে শিল্পীরা নাচেন। মুখোশ তৈরী করার সময় মন্ত্রপূত জল ছিটিয়ে দেয় কাঠের উপর গ্রামেরই দেবাংশী পুরোহিত। তারপর চরুস, বাইসলা দিয়ে কুঁদে কুঁদে মুখোশ তৈরীর কাজ শুরু হয়। শিল্পী নিজেও মন্ত্র জানেন। জিজ্ঞাসা করেছিলাম, ভুবন মোহান্তকে তিনি তৈরী করেছিলেন একটা বাঘের মুখোশ ! অয় বড় তেজী ! মন্তর না ফুকলে চলে ? সত্যিকারের বাঘ হয়ে নাকি খেয়ে ফেলতে পারে শিল্পীকে !

কিসের কিসের মুখোশ হয় ? শিল্পীর উল্টো জিজ্ঞাসা, কিসের না হয় ? বাঘ, ভালুক তো আছেই। আর চামাড় (চামুণ্ডা কালী), বুড়া-বুড়ি (শিব-চণ্ডী হলেও লৌকিক বুড়া-বুড়িই), সিংহল রাজা, রাবণ রাজা, শিকনিঢাল এইরকম হরেক দেব দেবীর মুখোশ !

শোলার মুখোশও তৈরী করেন শিল্পী। তার রকম হরেক। জলপাইগুড়ি থেকে মালদার মধ্যে অজস্র মুখোশের ছড়াছড়ি। মালদায় মাটির মুখোশও হয়। জলপাইগুড়িতে মুখা খেলার জন্য কাগজের মুখোশ তৈরী করেন

*সম্প্রতি কলকাতার এক মেলা থেকে পশ্চিম দিনাজপুর জেলার কুশমণ্ডী থানার রুয়ানগর গাঁয়ের আকালী সরকার যে অভিজ্ঞতা নিয়ে গেছেন তারই বলে ওই তাঁতপোইতে উল দিয়ে বুনেছেন চমৎকার একটি স্টোল।

শিল্পীরা। এতে দেবদেবী নেই। আছে পেয়াদা, কারকুন (রাজার রাজস্ব আদায়কারী), চোর-চুন্নীর মুখোশ।

এসব দামে বিকোয় না। অন্ততঃ এক সময় বিকোত না। এখন এগুলোর ধর্মীয় আবরণ খসিয়ে শিল্পে পরিণত করার চেষ্টা চলছে। ১৯২২ সালে পশ্চিমদিনাজপুর জেলার কাঠের মুখোশ যা কিনা রাম-বনবাস লোকনাট্যে ব্যবহৃত হত সরকারী কারুশিল্প প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার জিতে নিয়ে এসেছে। ওদের কাছে মুখোশের ব্যবহার নৃত্যে-নাট্যে আর আমাদের কাছে ঘর সাজাবার উপকরণ।

মুখোশের পর আসে গহনার কথা। বিয়েতে গহনার লেনদেন বাঙ্গালী সমাজে চিরন্তন। উত্তরবঙ্গেও দেখি রাজবংশী দেশী, পোলিয়া সমাজে বিয়ের অনুষ্ঠানে গহনার সমাদর। তবে সোনার চেয়ে রূপোর পেতলের গহনারই চল বেশি এখানে। নামগুলোও সুন্দর, বিচিত্র। এই গহনা তৈয়ারি করেন রাজবংশী কর্মকার। রাভা, মেচ মেয়েদের নিজস্ব সুন্দর সুন্দর গহনা আছে। কিন্তু এখন সেসব খুঁজে পাওয়া ভার।

রাজবংশী মেয়েরা মাথায় পরেন সিথা পাটি আর সেদবন। সিথাপাটি হ'ল অনেকটা টিকলির মতো। রুপোর একটি সরু শিকল সিথি বরাবর থাকে। আর সেদবনকে বলা যায় রুপোর শিরস্ত্রান। কর্ণমূলে রুপোর গোলাকার গহনার নাম ওস্তি বা এনস্তি। কানের ওপরের দিকে পরার জন্য যে গহনা তার নাম মাছিয়া পাত। ছোট ছোট রুপোর ফুল কানের লতিতে যখন আটকে থাকে তখন তার নাম পুজি। কর্ণবেষ্টনী শিকলের নাম শিসা। চাকি হল গোটা কান ঢেকে থাকা অলংকার। কানের মাকিরি তো সারা বাংলায় অতি পরিচিত। উত্তরবঙ্গেও সাধারণ রমণীর কানে কানে তা শোভা পায়।

নাকের নথ আছে দু' রকমের। সোলিয়া আর জলটুপা। আর আছে বালি, নোলোক, ফুল ও ফুরফুরি।

গলায় থাকে হার। এই হার হরেক রকম। সূর্যহার, চন্দ্রহার, শিকলি হার। আর আছে মালা—কাঠি মালা, মধুমালা, পোয়াল মালা। কণ্ঠহার আরো আছে। হাসুলী, গোট, কুচিয়া মার-হার, সিক্কা হার, টাকা চারা আর জনরা। একেকটি হার একেক রকম। এইসব হার সম্প্রদায়েরকর্মকার ছাড়া কেউ তৈরী করতে পারে না। আমি নিজে তা খোঁজ খবর নিয়ে জেনেছি।

হাতের বালারও বহু নাম। গোটা খারু, গোকুল খারু, মোটাখারু, মুঠিয়া খারু, চুরাতি, রতন চুর। এছাড়াও আছে সমস্ত উত্তরবঙ্গেই মেয়েদের হাতে হাতে শাংখা খারু আর মোটা খারু। বাহু খারু বা গজরা কিংবা সোমপাঞ্জি নামেও ২ ইঞ্চি থেকে ৪ইঞ্চি মোটা হাতের 'গাহেনা'র খবর পাওয়া যায়।

কোমরে মেয়েরা পরেন সিকোই আর গোট।

পদশোভার জন্য আছে ঠ্যাং খারু, বাঁক খারু, পার খারু, ছর খারু, এবং মল। এছাড়া পায়ের পাতার জন্য পাঁইজো, পাঁজোর আর পাঞ্জা। হাতের আঙুলের জন্য আংটি তেমনি পায়ের আঙুলের জন্য আছে আংটি।

এরপর আসে শোলার কাজ। শোলার হাতি, ঘোড়া পাখি ছাড়াও বিয়ের মালা, ফুল মুকুট তো আছেই। কিন্তু সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হল 'ব'। বিশেষভাবে শ্রাবণ সংক্রান্তির সময় বিষহরা ব্রতে এই 'ব'-গুলো দেখা যায়। শোলার তৈয়ারী মঞ্জুষ। তাতে আঁকা থাকে বেহুলা-লখীন্দর আর সাপ। শোলার মঞ্জুষ বা মাজুষের কাজ তো অতি সূক্ষ্ম। রঙের ব্যবহারও দেখবার মতো। ১লা ভাদ্র উত্তরবঙ্গের গ্রাম গ্রামান্তরে ঘুরলেই দেখা যাবে দিঘি বা পুষ্করিণীর মাঝখানে একটি বাঁশের মাথায় সেগুলো ঝুলছে। আকৃতিটি গোলাকার একটি চোঙের মতো। তার চারপাশে কদম ফুল দিয়ে সুন্দরভাবে সাজানো। ত্রিকোনাকৃতি একটি শোলার মধ্যে বিষহরি তথা মনসা আঁকা। ওই ত্রিকোনাকৃতি চারটে 'ব' জুড়ে একটি 'মুন্দিল' (মন্দির) হয়। কখনো বা বলা হয় লখাইয়ের বাসর ঘর। এ রচনা কর্ম এক কথায় অপূর্ব। এর একেকটি দিকে একেকরকম আঁকা। হাতি তো থাকবেই। বেহুলা, লখীন্দর, মনসা ও শিব এতে শোভা পায়। যদিও 'পট' নামটা উত্তরবঙ্গে কেউ জানেনা, কিন্তু আসলে এই 'ব'গুলো উৎকৃষ্ট পটের নিদর্শন। শোলার এইসব শিল্পীরা মালাকার নামে পরিচিত!

পশ্চিম দিনাজপুর জেলার বংশীহারী থানায় বৈরহাট্টা গ্রামে কর্তিকমাসের চণ্ডীপুজোর সময় কুলোর পিঠে আঁকা ভুষোকালির ওপর সাদা খড়ি মাটি দিয়ে একটি কালীর মুখ দেখছি। কাজটি সরল হলেও অসাধারণ শিল্প নৈপুণ্যের পরিচায়ক। শিল্পীকে খোঁজ করে পাইনি।

ওই জেলারই কালিয়াগঞ্জ থানার [illegible]নোর গ্রামে পোলিয়া মৃৎশিল্পী আছেন ক'ঘর। তাদের তৈরী ছোট ছোট পীরের ঘোড়া যে কোন শিল্প প্রত্নশালার

উৎকৃষ্ট সংগ্রহ হ'তে পারে। এই গ্রামেই দেখেছি আরো কতকগুলো ছোট ছোট মনোহারী কাজ। সবগুলোই প্রয়োজনের সামগ্রী যেমন তেলের ভাঁড়—পেচি ও ঠেকি। পেচি দেখতে অনেকটা কুঁজোর মতো। আধুনিক হিসাবে ৫০ গ্রাম ১০০ গ্রাম সরষের তেল ধরে এই সব পেচিতে। রান্নাঘরে এই পেচি থাকে। উল্টে গেলেও তেল পড়ে যায় না। ২৫০ গ্রাম থেকে ৫০০ গ্রাম কিংবা তার বেশি তেল ধরে যে পেচিতে তার নাম তারি। বিয়ের সময় পাত্রপক্ষ কনের মাকে ওই একতারি তেল দেবেন। নয়তো বিয়ে হবে না। তেলের ঠেকি অনেকটা হাঁড়ির মতো দেখতে। ঠেকির গায়ে টেরাকোটার কাজ। উভয়ের রঙ কালো। তুষের ধোঁয়ায় এ সবের রঙ তৈরী হয়। বেশ মাজা মাজা।

এই পোলিয়ারা তৈরী করেন চুন রাখার পাত্র চুনাতি। ধূপদানি। সুন্দর মাটির প্রদীপ—যার নাম চেরাগ। এই পলিয়া শিল্পীরা নিজেদের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী ছোট ছোট মাটির পুতুলও তৈরী করেন। পিঠে সন্তান বাঁধা রমণী, হাতির পিঠে চড়া মাহুত, কাঁখে ডালি মেয়ে। অনেকটা ষষ্ঠী পুতুলের আদল।

বেতের তৈরী ধান মাপার কাঠা। বাঁশের তৈয়ারি মাছ ধরার যন্ত্র, এ ছাড়া ডালা, কুলো, ডালাও দেখেছি নানা আকারের উত্তরবঙ্গের অখ্যাত সব হাটে। প্রয়োজনের সামগ্রী বলেই টিঁকে আছে। বাঁশের আরো কাজ আছে হরেকরকম, আছে মাদুরের কাজ।

উত্তরবঙ্গ আদিতে মোঙ্গলীয় জনগোষ্ঠী কোচ, রাজবংশী, দেশী, পোলিয়া, মেচ রাভা, টোটোর বাসভূমি হলেও ধীরে ধীরে নানা কারণে এইভূমিতে এসে জমায়েত হয়েছে ছত্রিশ জাত। সুতরাং এই অঞ্চলের কারুশিল্পে বহুজনের অবদান থাকলেও প্রাধান্য হারায়নি আদি নিবাসী ওইসব জনগোষ্ঠী। উত্তরবঙ্গের শিল্প-সংস্কৃতি বলতে এখনো বস্তুতঃ তাদের শিল্প-সংস্কৃতিকেই বোঝায়। কারুশিল্পের ক্ষেত্রেও ওই একই জবাব।

মুখা মোখা মুখা ॥ পুরুলিয়ার 'ছো' নাচের সঙ্গে তাব মুখোশ এখন বিশ্ববন্দিত। তার প্রচাবের এমনি জোব যে বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের মুখোশ বা তার নৃত্যের বড় বেশি খোঁজ রাখি না আমরা। মালদহের গম্ভীরা নৃত্যে সব সময় মুখোশ ব্যবহার হয় না। কিন্তু, সেখানকার মুখোশের যে নমুনা আমরা দেখেছি তাও কম প্রশংসার যোগ্য নয়।

মালদহে মুখোশ 'মুখা' নামে পরিচিত। এই মুখোশ আগে প্রধানত নিম কাঠ দিয়ে তৈরী হত। এখন অধিকাংশ মুখোশই মাটি দিয়ে তৈরী হয়। এই মুখোশগুলির মধ্যে কালী, নরসিংহ, রাম, লক্ষ্মণ, হনুমান, বুড়া-বুড়ী. শিব, ভূত, প্রেত, কার্তিক, প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

মালদহেব মুখোশ প্রসঙ্গে আদ্যের গম্ভীরা লেখক প্রখ্যাত হরিদাস পালিত জানিয়েছেন, "মুখার উর্দ্ধদিকে ও পশ্চাদংশে একটি এবং দুই কর্ণের পশ্চাতে দুইটি ছিদ্র দৃষ্ট হয়, তাহাতে রজ্জু সংবদ্ধ থাকে, সেই রজ্জুদ্বারা মুখা মুখের উপর বন্ধন করা হয়। মুখার ঘর্ষণ হইতে মুখ রক্ষা করিবার জন্য চাদর বা বস্ত্রখণ্ড দিয়া কর্ণ বেষ্টন করিয়া পাগড়ী বাঁধা হয়" বৎসরান্তে গম্ভীরার সময়ে এই মুখোশ দেখতে পাওয়া যায় মালদহ ও তার আশপাশ অঞ্চলে। পুরুলিয়ার মুখোশ যেমন অনায়াসলভ্য মালদহের মুখোশ তেমন নয়।

সম্প্রতি মালদহ-সীমান্তবর্তী অঞ্চলে ঘুরে এই মুখোশের খোঁজ নিয়েছি। তাতে বুঝেছি, মালদহের 'মুখা'র পৃষ্ঠপোষক সমস্ত মালদহবাসী নয়। যেসব গ্রামে গম্ভীরা শিল্পীরা থাকেন, তারাই প্রধানত এর পৃষ্ঠপোষক। গম্ভীরা বা গাজনের মেলায় মুখোশ ওঠে, বিকোয় জলের দরে, অথচ এমন সুন্দর শিল্পকর্মের দাম পায় না শিল্পীরা। এই মুখোশের এমনি আকর্ষণ যে মালদহ সীমান্ত বিহার অঞ্চলে সাধারণ গ্রামবাসীর ঘরে তা সযত্নে রক্ষিত।

বস্তুত উত্তরবঙ্গের মুখোশ বলতে তবু সাধারণভাবে আমরা মালদহের গম্ভীরা মুখার কথাই জানি। জেলা শিল্পদপ্তর উদ্যোগ গ্রহণ করলে এই মুখোশের প্রচার হত জেলার বাইরে। অনায়াসলভ্য হত লোকশিল্প রসিকের কাছে। ফলে, বাঁচতেন শিল্পী।

জলপাইগুড়ি জেলায় রাজবংশী সমাজ মুখোশকে 'মুখা' বলেন। এদিক থেকে মালদহের সঙ্গে মিল আছে। মালদহের 'মুখা' নাচ শুধুমাত্রই ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত, কিন্তু জলপাইগুড়ি জেলার 'মুখা-খেলা' একান্তভাবেই ধর্মীয় অনুষ্ঠাননির্ভর নয়। ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে রাম-রাবণ, শিব-দুর্গা, মনসা প্রভৃতি প্রাধান্য পায়। একটা বিশেষ পৌরাণিক মন এর মধ্যে কাজ করে। কিন্তু সামাজিক ও গার্হস্থ্য জীবন-নির্ভর 'মুখা খেলা'র মধ্যে দৈনন্দিন জীবনের টুকরো টুকরো চিত্র বিন্যস্ত থাকে।

জলপাইগুড়ি জেলার 'মুখা'গুলি কাঠ, লাউ, পোড়ামাটি, পুরু কাগজ বা পাতলা শোলা দিয়ে তৈরী। কাঠের বা লাউয়ের খোলের উপর কাদা দিয়ে ন্যাকড়া এঁটে দিয়ে সেই ন্যাকড়ার উপর চিত্রকর চিত্র করে দেয়। যে কেউ এই মুখা তৈরী করতে পারে না। যে সূতাহার বা সূত্রধর অধিকারী, সেই মুখা তৈরীতে সক্ষম।

এইসব অঞ্চলে মনুষ্যাকৃতির মুখা ছাড়াও দৈত্য-দানব ও পশুর মুখাও ব্যবহৃত হয় কোন কোন ক্ষেত্রে। তবে, গম্ভীরার প্রচলন নেই এখানে।

অন্যপক্ষে পশ্চিম দিনাজপুর জেলার রাজবংশী বিশেষত পলিয়া-দেশী সমাজে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে 'গমীরা খেলা'য় মুখোশ ব্যবহৃত হয়। এই অঞ্চলে তা 'মোখা' নামে প্রচলিত। এই 'মোখা' একমাত্র ছৈতন বা 'ছাতিম' গাছের কাঠ দিয়ে তৈয়ারী। মাটির মোখা দেখা যায় না। এখনকার 'গমীরা খেলা'য় শিবের কোন স্থান নেই। বুড়ো-বুড়ি, চামাড় কালী বা উড়ন কালীই

প্রধান। উড়ন কালীর (যার গ্রামীণ নাম 'শিকনিঢাল') মোখা আকারে সুবৃহৎ এবং ভয়ঙ্কর দর্শন।

'রাম-বনবাস' পৌরাণিক যাত্রায় অশোক বনের চেরী, হনুমান, পাতালের দানব, পঞ্চবটী বনের বাঘ, ভাল্লুক, গণ্ডার, মায়া হরিণ প্রভৃতির সব মুখোশ ব্যবহৃত হয়। 'হনুমান'-এর মোখা বিশেষভাবে ব্যবহৃত ও রক্ষিত। এর সঙ্গে প্রধান একটি ধর্মীয় বিশ্বাস যুক্ত।

চোর-চুরণীর গানে কিছু শোলার মুখোশ পরতে দেখা যায়। এই গান জলপাইগুড়ি ও পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় রাজবংশী, দেশী ও পলিয়াদের মধ্যে কালীপূজোর অমাবস্যা তিথি কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত হয়। আমার কাছে যতদূর খবর আছে, তাতে বলতে পারি, এইসব মুখোশগুলিকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে সংরক্ষণের কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

দার্জিলিং জেলার নেপালীদের মুখোশ উত্তরবঙ্গে সর্বাধিক প্রচারিত ও বিখ্যাত। সম্ভবত এই মুখোশগুলির মূল্য যত না art তার চেয়ে বেশি Industry হিসেবে। তবে, দার্জিলিং-এর নেপালী সমাজের লোকায়ত সাংস্কৃতিক জীবনে এই মুখোশের একটি বিশেষ মূল্য রয়েছে।

উত্তরবঙ্গের মুখোশ শিল্প সম্পর্কে খুব বেশি আলোচনা চোখে পড়েনি। ডঃ নির্মলেন্দু ভৌমিক তাঁর গবেষণা গ্রন্থ 'প্রান্ত উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত', বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় 'বাংলা দেশের সঙ প্রসঙ্গে' এবং ডঃ প্রদ্যোৎ ঘোষ যথাক্রমে জলপাইগুড়ি ও মালদহের 'মুখা' প্রসঙ্গে কিছু আলোচনা করেছেন। কিন্তু পশ্চিম দিনাজপুর ও কোচবিহার জেলার মুখোশ সম্বন্ধে কোন আলোচনা এখনো আমাদের নজরে আসেনি।

সৌভাগ্যবশতঃ ভারতীয় যাদুঘরের ডঃ সবিতারঞ্জন সরকার পুরুলিয়ার আলোচনাচক্রে উপস্থিত ছিলেন। তিনি পরবর্তীকালে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং পশ্চিম দিনাজপুর জেলার গভীর গ্রামাঞ্চল থেকে যাদুঘরের জন্য বেশ কিছু কাঠের মুখোশ সংগ্রহ ক'রে নিয়ে আসেন।

পশ্চিম দিনাজপুর জেলা শিল্পকেন্দ্রের প্রাক্তন জেনারেল ম্যানেজার সত্যেন মিত্র এই মুখোশের বাজার তৈয়ারির ব্যাপারে আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। তাছাড়া, তাঁরই আগ্রহে এবং আমার সহযোগিতায় এই মুখোশ পশ্চিমবঙ্গ কারুশিল্প প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করে। বাইশ বছরের একটি রাজবংশী

দেশীয়া যুবক শচীন্দ্রনাথ সরকার এই মুখোশের শিল্পী। কিন্তু দ্রুত নগরায়ণ ও নানা সংস্কৃতির চাপে এই মোখাশিল্প বিলুপ্তির পথে। অনুসন্ধান নিয়ে দেখেছি, এ জেলার মোখা খুব সহজলভ্য নয়। গ্রামে গ্রামে ক্রমশঃ মোখা শিল্পীর অভাব ঘটছে। পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় এখন অঙ্গুলীমেয় যে কজন মোখাশিল্পী রয়েছেন তাঁরা চাষবাস নিয়ে ব্যস্ত। মোখা তৈয়ারির সময় কোথায়! টুঙ্গুল গ্রামের নগেন রায়কে এই নিয়ে প্রশ্ন করেছিলাম। তিনি জবাবে জানিয়েছিলেন, মোখা তৈয়ারি কারো পেশা নয়। সময় ও সুযোগ মতো এগুলো তৈয়ারি করেন প্রধানতঃ উৎসব, অনুষ্ঠানের জন্য। উৎসব-অনুষ্ঠানও ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে। কমছে লৌকিক বিশ্বাস। ফলে, এ সবের চাহিদাও কমছে। তবে নগেন রায়ের মত হলো, মোখা তৈয়ারি করে যদি অর্থ পাওয়া যায় তবে গ্রামে গ্রামে শিল্পীদের মধ্যে আবার উৎসাহ দেখা দিতে পারে।

কৃষ্ণবাটী গ্রামের শচীন্দ্রনাথ সরকার মোখা শিল্পে প্রথম স্থান অধিকার করার পর ব্যাঙ্কের ঋণ পেয়েছেন। কুশমণ্ডী থানার রুয়ানগর গ্রামের শঙ্কর সরকার পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় কারুশিল্প প্রতিযোগিতায় পুরস্কৃত হয়ে উৎসাহ পেয়েছেন। উত্তরবঙ্গ লোকযান—লোকশিল্প সংকৃতি ও শিল্পীর উন্নয়ন কেন্দ্র এখন মুখোশের বাজার সৃষ্টিতে তৎপর। ইতিমধ্যে কলকাতার কয়েকটি মেলা এবং ক্রাফ্ট কাউন্সিল অব ওয়েস্ট বেঙ্গল প্রভৃতি সংস্থার মাধ্যমে মুখোশ বাজার পেতে শুরু করেছে। সুদূর লণ্ডনেও গিয়ে হাজির হয়েছে। সেখানে পশ্চিম দিনাজপুরের মোখা সমাদর পেয়েছে।

কিন্তু, এ কোন একটি সংস্থা বা ব্যক্তির কাজ নয়। সরকারী উদ্যোগ অনেক বেশি দরকার।

ব্রাত্যজনের নৃত্য-গীত॥ এই নিবন্ধে এই অঞ্চলের কয়েকটি স্বল্পজ্ঞাত নৃত্য-গীত-উৎসবের পরিচয় রাখব। প্রথমেই উল্লেখ করা যাক উত্তর সীমান্তের মেচ উপজাতির নৃত্য-গীতের কথা।

এই মেচরা জলপাইগুড়ি জেলার মেচি নদীর তীরে বসবাস করেন। সম্ভবত মেচি তীরের বাসিন্দা বলেই তারা মেচ। এ বিষয়ে ডঃ চারুচন্দ্র সান্যাল তাঁর দ্য মেচেস এণ্ড দ্য টোটোস গ্রন্থে অনেক কথাই জানিয়েছেন। তবে মেচদের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত যে পরিচয় তাতে বলতে পারি তাঁরা নিজেদের আদি বড়ো জাতির পরিচয়ে গর্বিত। মেচদের যে দুটি সাংস্কৃতিক সংস্থার কথা জানি তার নামেই এদের পরিচয় লক্ষণীয়। এক, কংকোতি বড়ো কৃষ্টি আফৎ, দুই, রঙ্গালি বড়ো কৃষ্টি আফৎ।

এখন এই মেচদের নৃত্য-গীতের পরিচয় কি? গবেষক সুনীল পাল জানিয়েছেন, 'জলপাইগুড়ি জেলার মেচ জনজাতির জীবনবৃত্তে নৃত্যের স্থান বিশেষভাবে রয়েছে। পূজা-পার্বনে ঋতু উৎসবে ও অন্যান্য আচার অনুষ্ঠানে তাঁরা নৃত্য করেন। তাঁদের নৃত্যে রয়েছে লালিত্য, আবেগ ও নান্দনিক ঐশ্বর্য।' তাসত্বেও ওরা ব্রাত্য, উপেক্ষিত আমাদের কাছে।

মেচদের নাচের নাম 'মশানায়' ও গান 'মেথায়'। 'বৈশাগু' নববর্ষ বরণের নাচ। মেয়ে-পুরুষ এ নাচে অংশ গ্রহণ করেন। 'মায় নাও বুড়ি বরায় নায়' নাচ গৃহদেবী 'মায়নাও'র নামে উৎসর্গীকৃত। এর মধ্যে ভক্তিপ্রাণতা ভাবরসে পরিপুষ্ট।

মেচরা আজ হয়তো আদিম অরণ্যচারী জীবনযাত্রার সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়, কিন্তু একদা এই জীবনযাত্রাই ছিল তাদের সঙ্গী। তাদের কিছু কিছু নাচে এখনো সেই জীবনের স্মৃতি বাহিত। অরণ্যে কাষ্ঠ সংগ্রহে যাবার যে নৃত্য আজও

তাদের মধ্যে প্রচলিত তার নাম বোং কাং বাদরী'।

অরণ্যচারী জীবন থেকে কৃষিভিত্তিক সমাজজীবনে উত্তরণের সুস্পষ্ট ছবিও পাওয়া যায় তাদের নাচে। ধান্য রোপনের 'মায়গায় নায়' নৃত্য সেই ছবি বহন করে।

এই মানুষদের জীবনে প্রকৃতি আজন্ম সঙ্গী। ক্ষেতে ক্ষেতে প্রজাপতি ছুটে বেড়ায়, তাকে ধরার বাসনা তীব্র। 'গান ডেওলা' নাচে প্রজাপতি ধরার দৃশ্যটি বড় সুন্দর।

মেচদের বিবাহ-উৎসবে আয়রাতি বৈরাতির বিশেষ ভূমিকা। পশ্চিম দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি জেলার রাজবংশী দেশী পলিদের বিবাহ-উৎসবেও 'আয়রাতি বৈরাতির' প্রাধান্য। এরাই বরযাত্রী কনেযাত্রী। মেচদের 'বৈরাতি মশানায়' নৃত্য খুবই বর্ণাঢ্য ও অনুপম। তবে বৈরাতি নাচ মেচ মেয়েরাই বিয়ের দিনে করে থাকেন।

তাদের রণনৃত্যের নাম 'ঢালথুংরী মশানায়'। অতীত যুগের যুদ্ধরীতি ও বীরত্বের ব্যঞ্জনা এতে প্রতিভাত। বসন্তোৎসবের নৃত্যের নাম 'বাগরুম্বা'। নানা রঙির পোশাক এই নৃত্যে মেয়ে-পুরুষ উভয়েই উদ্বেলিত হৃদয়ে অংশ গ্রহণ করেন।

মেচরা শিবভক্ত। উত্তরবঙ্গের রাজবংশী কোচরাও তাই। কিন্তু শিবপুজোর জন্য পুষ্পচয়নের যে নৃত্যটি (থুবসি গেলেনায়) মেচদের মধ্যে রয়েছে তা রাজবংশী বা অন্য জনজাতির ভেতরে দেখা যায় না। এইসব নাচে যেসব বাদ্যযন্ত্রগুলো ব্যবহৃত হয় তার নাম গুলো এইরকম : খাম, মেরজা, চিকুং, ওয়াবিশি, যোথা।†

উত্তরবঙ্গের আরেক ব্রাত্যজন রাভা। ডুয়ার্সের ঘন অবণ্য পরিবেশে তাঁদের জীবন ও সমাজে নৃত্য-গীত এক অচ্ছেদ্য সম্পর্কে যুক্ত। রাভারা মাতৃতান্ত্রিক। নৃত্যকে তাঁদের ভাষায় বলা হয় 'বসিনি,' সঙ্গীতকে 'চায়।' রাভা পুরুষ মেয়েরাও যৌথভাবে নৃত্যগীতে অংশ গ্রহণ করেন। এদের নৃত্য প্রধানত আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্মের সঙ্গে জড়িত। বিবাহ, শ্রাদ্ধানুষ্ঠান, দেবোপাসনা,

† জলপাইগুড়ির খরভাঙ্গা এলাকায় যে মেচরা বসবাস করেন, তাঁদের একটি দল, দিল্লী, কলকাতায় নৃত্য পরিবেশন ক'রে প্রশংসা কুড়িয়েছেন।

ঋতুউৎসবে নৃত্য স্বতস্ফূর্ত। গৃহদেবী রস্তুক বাশেক পুজোয় এবং নববর্ষে নগউকন বাকেঞ্জীতে সারাঙ্গা বা পুরোহিত নৃত্য করেন। এখানে সারাঙ্গার নৃত্য একক।

মৃতদেহ শ্মশানে নিয়ে যাবার আগে মৃতের উদ্দেশ্যে মদ ও জল নিবেদন অনুষ্ঠানের নাম 'চিকা বারায়'। নৃত্যের মাধ্যমেই এই অনুষ্ঠান পালিত হয়। শ্রাদ্ধানুষ্ঠানেও নানারকম বাদ্যযন্ত্র ও সঙ্গীতের তালে তালে রাভারা নৃত্য করেন। ডাংসি, কালবাঁশী, গোমাক, বামক ডিংডং ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্রের নাম। শ্মশানযাত্রায় কৌমের সকলেই সমবেত নৃত্যে অংশ নেন। তখন তাঁদের হাতে থাকে তীর ধনুক ঢাল ও দা। মৃতজন যে ঘরে বাস করতো সেই ঘরের চালের খড় খুলে নিয়ে উঠোনে ছড়ানো হয় এবং তার উপর 'দেব্‌মেরেক্কী' বা উদ্দাম নৃত্য করতে করতে শববাহকেরা শ্মশানের দিকে যাত্রা শুরু করেন। এই নৃত্যের নাম 'মৈরবার চাডি' বা 'মৈর গুড়ুডি।' মৃতদেহ দাহের তিনদিন পরে 'চিলা দেখানো' অনুষ্ঠান বা 'তৌলেঙ চৈঁয়া'র দিনেও নৃত্য অনুষ্ঠিত হয়। রাভাদের বিশ্বাস এই নৃত্য না করলে মৃতের হাড় ভাঙ্গে না।

রাভাদের বীজ বপনের নৃত্যের নাম 'হাঙ্গায় সানি।' মৎস্য শিকারের নৃত্যকে বলা হয় 'মাকচেং রেনি'। মেয়েরাই নৃত্যে অংশী। মৎস্যশিকারের নৃত্যে মেয়েরা কোমরে খলুই বেঁধে হাতে জাকৈ নিয়ে জলের মধ্যে মাছ ধরার দৃশ্যটি সুন্দর-ভাবে রূপ দেন। 'হাপাঙ' নৃত্যে তাঁরা রূপ দেন জমি চাষ, কোদাল কোপানো, ভূমি পূজা, শস্য বোনা সমেত যাবতীয় কৃষিকর্ম।

রাভাদের যুদ্ধ নৃত্যের নাম 'হাণ্ডাবরু'। এই নৃত্যে দেখানো হয় নারী-পুরুষ নির্বিশেষে বহির্শত্রু প্রতিরোধের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের দৃশ্য। নৃত্য-শিল্পীদের হাতে থাকে ঢাল ও তরবারী।

হাসি-তামাসামূলক নাচও রাভাদের মধ্যে রয়েছে। 'মাকপর বসিনি' বা ভালুক নাচ তারই একটি। কার্তিক মাসে কালীপুজোর ছয় সাতদিন আগে তাঁরা ভালুক নাচের আয়োজন করেন। ভালুকের মুখোস পরে কলাপাতা দিয়ে সারা গা মুড়ে বাড়ি বাড়ি ঘুরে মাঙ্গন তোলেন রাভারা। এই নাচ কালীপুজো উপলক্ষে হলেও নিতান্তই চিত্তবিনোদনের ব্যাপার।

মোঙ্গল জনজাতির নৃত্যে হস্ত প্রকরণ ও মুদ্রা দুর্লক্ষ। বুকের নিম্নাঙ্গ থেকে পদক্ষেপণের নানা কাজেরই প্রাধান্য। বক্ষদেশ স্কন্ধ গ্রীবা কিংবা মুখ বা

চোখের কাজ সামান্যই। বলতে গেলে নেই। রাভাদের নৃত্যেও এগুলোই দেখ যায়। বলাবহুল্য, তাঁরাও মোঙ্গল জনজাতি-সম্ভূত।

রাভা মেয়েরা রঙিন ও নক্‌সী স্ফুন, কাম্বাং কেমব্লেট ও ফাক চাক পরিধান করেন। কোমর বন্ধনী তাঁদের লবক, গলায় স্থকিমালা কিংবা টঙ্কা মালা। পুরুষেরা মাথায় বাঁধেন রঙিন পাগড়ি, কোমরে জড়ান রঙিন উত্তরীয়। এইসব পোশাকে নৃত্য পরিবেশিত হয় সমাজেরই কারো বাড়ির বিস্তীর্ণ অঙ্গনে।*

উত্তরবাংলার ব্রাত্যজনগোষ্ঠী একটি দুটি নয়। জনগণনার প্রতিবেদন হাতে নিলে দেখা যাবে তাদের সংখ্যা শতাধিক। এবং সকলেরই সাংস্কৃতিক দিক থেকে কিছু না কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। কিন্তু স্বল্প পরিসরে সেই সাংস্কৃতিক রূপালেখ্য রচনা এক দুরূহ কর্ম। তাই, বেছে নিতে হয়েছে অঙ্গুলিমেয় কয়েকটি।

এই জনগোষ্ঠীগুলোর মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজবংশী সম্প্রদায়। তাঁরা সারা উত্তরবাংলায় ছড়িয়ে আছেন। কয়েকটি উপগোষ্ঠীও রয়েছে এঁদের মধ্যে। যেমন, দেশী ও পলি। পশ্চিম দিনাজপুর এবং মালদা জেলায় এঁদের বসবাস।

এই রাজবংশী জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক জীবনে নৃত্য-গীত এক অপরিহার্য অঙ্গ। বৈশাখ থেকে চৈত্রের মধ্যে বারোমাসি জীবনে তাঁদের নানা উৎসব অনুষ্ঠান। আর এসবই নাচে-গানে ভরা।

বর্ষপরিক্রমায় দেখা যাবে মেছেনী, শিবখেলা, হুদুমা বা জলমাঙ্গা, জলভুকা, ব-খেলা, জিতুয়া, গোরু চুমানী, খজাগর, চোরচুন্নী, কাতিঠাকুর, নয়াখোয়া, পুষুণা, হোলি, মদনকাম, পাগলাপীর, ঘাটো-ব, বিষুয়া, বারোমাসিয়া, মোখা খেলা বা গমীরা উৎসব অনুষ্ঠান নৃত্য-গীতে ভরা।

এর বাইরেও যে জীবনছন্দ তাতেও দেখা যাবে অসংখ্য নৃত্যগীতের পসরা। ছোয়ানিন্দানী ও ছোয়াভুলকানী, ভাত-ছোয়ানী, ফুল ফুটানী, রঙ-হাউসালি, চেঙ্গেরা ভুলা, বন্ধু নাচানী, বাউদিয়া, মাঝির গান, তেলেঙ্গার গান, বিহোর বা বেহার গান, বট-পাকুড়ের বেহার গান, ধান-কাটা, ধান ভুকা, ওঝালিয়া মড়াখোয়া প্রভৃতি।

চিত্তবিনোদন ও কর্মসঙ্গীতও রাজবংশী সম্প্রদায়ের কম নয়। ফাকসালি, খ্যাচেরা বা খিসা, খন, পালাটিয়া, বাউস্থা-বাউস্থানী, ভাওয়াইয়া, বন্ধুআলা,

*জলপাইগুড়ি অঞ্চলের রাভারা ইতিমধ্যে তাঁদের গাঁয়ের বেড়া পার হয়ে কলকাতার মঞ্চে নৃত্য পরিবেশন করে রসিকজনের প্রশংসা পেয়েছেন।

বিরহ-আলা, ভাণ্ডীখেলী, বাঘনাচানী, ফাঙ্গাইত্, মৈষালী।

ভক্তি-গীতিও তাঁদের যথেষ্ট। বিষহরা, চণ্ডীয়ালা, সত্যপীর, সোনারায়ের গান, দেহতত্ত্ব, তুক্ষা, ষাইটোন, নটুয়া প্রভৃতি।

এ সব গানের কিছু পরিচয় পাওয়া যাবে ডঃ নির্মলেন্দু ভৌমিকের প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত, হরিশ্চন্দ্র পালের উত্তরবঙ্গের লোকগীতি, ডঃ গিরিজাশঙ্কর রায়ের রাজবংশী সম্প্রদায়ের পূজা-পার্বণ এবং ডঃ চারুচন্দ্র সান্যালের রাজবংশীস অব নরথ বেঙ্গল বইয়ে। উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীতের সুর ও তাল প্রসঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথ রায়ের লেখাটি প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসংগীত গ্রন্থের এক বিশিষ্ট সংযোজন।

এই অঞ্চলের নৃত্যের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য তেমন কোন বই এখনো রচিত হয়নি। অথচ অধিকাংশ সঙ্গীতই নৃত্য সহযোগে পরিবেশিত।

সঙ্গীতের সুর প্রধানত প্রকৃতি-পরিবেশ থেকে জাত, নৃত্যের তাল, গতিভঙ্গি, পদক্ষেপণের পেছনেও রয়েছে ওই প্রকৃতির প্রধান ভূমিকা। যাকে নৃতাত্ত্বিকেবা বলেন ইকোলজি।

উত্তরবাংলার প্রকৃতি-পরিবেশে একদিকে পাহাড় ও নিবিড় অরণ্যানী, অন্যদিকে তিস্তা, করতোয়া, জলঢাকা, রায়ডাক, সঙ্কোশ, মহানন্দা, আত্রেয়ীর মতো নদী। এ ছাড়াও রয়েছে অসংখ্য ছোট ছোট নদী, খাড়ি। সমতলভূমি সামান্যই। উঁচু-নীচু মালভূমিতে ভরা। জলাজমিও তার কম নয়। এই পরিবেশে হাতি, বাঘ এবং বিচিত্র জন্তু-জানোয়ার আর পাখির সমারোহ। এখানে আসামের বনাঞ্চল ক্রমশ দক্ষিণমুখো তৃণাঞ্চলে পরিণত।

এই দুর্গম প্রাকৃতিক পরিবেশে যে ব্রাত্যজন দীর্ঘকাল ধরে বসবাস করছেন তার নৃত্যগীতের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নেওয়া অনেকের পক্ষেই কঠিন। তাই বোধকরি, এই অঞ্চলের নৃত্য-গীত প্রসঙ্গে আলোচনা হয়েছে সামান্যই।

নৃত্য-গীতে প্রকৃতি পরিবেশের ভূমিকা যেমন প্রধান তেমনি অপরাপর সাংস্কৃতিক প্রভাবের মূল্যও কম নয়। 'রাম বনবাস' এর মতো একটি নৃত্য-গীতিনাট্যে যুদ্ধের সঙ্গীতে নজরুলের 'চল চল চল ঊর্ধ্ব-গগনে বাজে মাদল নিম্নে উতলা ধরণী তলের' অতি পরিচিত সুর শুনে চমকিত হই। কথাপ্রসঙ্গে রাধিকামোহন মৈত্র জানিয়েছিলেন এই সুরের বিষয় জানতেন ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। যুদ্ধ সঙ্গীতে এই সুর খুবই জনপ্রিয়।

অবাক হ'তে হয় উত্তরবাংলার রাজবংশী সম্প্রদায়ের যুদ্ধ নৃত্যে এই সুর এখনো কেমন সচল।

গম্ভীরা বা মোখা খেলার প্রতিটি চরিত্রের নৃত্যভঙ্গী স্বাতন্ত্র্যপূর্ণ। কাঠের বিশাল মুখোশ পরে দশানন রাবণের নৃত্যে নটরাজের ঢং। অসুরনাশিনী দুর্গার নাচের ছন্দে সর্পের গতিভঙ্গী। বাঘ-ভালুকের যুদ্ধনৃত্য দেখার মতোই বটে। গম্ভীরা নৃত্যে অনেকগুলি দ্বন্দ্বযুদ্ধ আছে--সেগুলো দেখতে দেখতে সর্প-নেউলের যুদ্ধরীতি মনে আসে।

সিংহল রাজের যুদ্ধ নৃত্য চমৎকার। এখানে পদক্ষেপণেও নটরাজের কথা মনে পড়ে। সকম্পাণ হাত দুটির মুদ্রাও খুবই সুন্দর। চণ্ডী, চামুণ্ডার নৃত্য বাজনার সঙ্গে সঙ্গে প্রথমাংশে যেন মনে হয় নদীর ছোট ছোট ঢেউ। পায়ের পাতার ওপর ভর দিয়ে তারা সারা মাঠময় নাচে ; তখন পদক্ষেপণও দীর্ঘ। চামুণ্ডার গতি যখন ক্ষীপ্র, তখন তার পদক্ষেপণও দীর্ঘ। বুড়াবুড়ির মুখোশের সঙ্গে তার নৃত্যটিও চমৎকার মানানসই। জটায়ুর পাখা ঝাপটানো দেখার মতো। শিকনিঢাল চরিত্রটির নামায়নেরমধ্যেই 'শকুন' কথাটি রয়েছে। শকুন যেমন একটি গলিত শবকে কেন্দ্র করে আকাশে উড়ে উড়ে ঝপ্ ক'রে মাটিতে নেমে আসে শিকনিঢালও তেমনি শকুনের গতিভঙ্গিতে মাঠময় ঘুয়ে ঘুরে শকুনের গতিতেই যেন সে মৃতদেহটির কাছে নেমে আসে। শকুন যেভাবে ভয়ঙ্কর উল্লসিত ভঙ্গিতে মৃতদেহের চারপাশ ঘুরে ঘুরে মাঝে মাঝে মাংস খুবলে নেয়। সেই একই ভঙ্গিতে শিকনি ঢাল এক বিশাল দানবোচিত মুখোশ পরে নাচে।

পশ্চিম দিনাজপুর জেলার দেশী-পলিদের কাছে শিকনিঢাল এক ভয়ানক অপদেবতা। একদিকে তার গতিভঙ্গি শকুনের মতো, অন্যদিকে তার আচরণ দানবের মতো। রাজবংশী পলি শিল্পী তার নৃত্যে এই দুইরূপই এই চরিত্রে ফুটিয়ে তোলেন।

'খন' বা 'পালাটিয়া' প্রধানত নাট্যগীতি হলেও নৃত্যবর্জিত নয়। এখানে নৃত্য গানের তালে গড়া। এখানকার চরিত্রগুলোর নাচে হাতির চলার ছন্দ দেখা যায়। ময়ূরের কিংবা বনমোরগের গ্রীবাভঙ্গি ক'রে ভাঁড়। এই গ্রীবাভঙ্গি দেখেছি গম্ভীরা নাচেও। মেয়েদের কোমরের কাজ নদীর বীচিভঙ্গের সঙ্গে তুলনীয়। আরেকটি দিক লক্ষণীয়। হয়তো দীর্ঘকাল পাহাড়-জীবন সঙ্গী থাকায় যেমন বাস্তব সমাজজীবনে মেয়েরা পিঠে বহন ক'রে শিশু বা অন্যান্য

বস্ত্র, নৃত্য-গীতেও তারা অনায়াসে শিশুকে বা কোন বস্ত্র বেঁধে নেয়।

জলমাঙ্গা গানে মেয়েদের কাঁধে কাঁধ দিয়ে সমবেত নৃত্য সঙ্ঘবদ্ধতার ভাবজ্ঞাপক। হয়তো অনেকে একে নৃত্যের বদলে 'নৃত্ত' বলবেন। জলমাঙ্গা বা হুদুমা হলো খরাকালীন বর্ষা আবাহনের নৃত্যগীত। এখানে বহু বিচিত্র সব নৃত্য আর গীত। সমস্ত অনুষ্ঠানটি আদিম যাদুবিশ্বাসের সঙ্গে যুক্ত।

আমাদের মনে রাখতে হবে, অর্থ নৈতিক কারণে সমাজ-সভ্যতা ও তারসাংস্কৃতিক চরিত্রের রূপ বদল হয়। তাই, যে কোন জনগোষ্ঠী বৃহত্তর জনসমাজের নিকটবর্ত্তী হয়ে যখন একই আর্থ-সামাজিক বিকাশের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে তখন তার সাংস্কৃতিক চরিত্রের পরিবর্তন আসে। আধুনিক রাজবংশী সম্প্রদায়ের নৃত্য-গীতে যদি কেউ সেই পরিবর্তন দেখতে পান তবে বোধকরি তার কারণ ওই।

রাজবংশী সমাজে মেয়ে-পুরুষের যৌথ নৃত্যের প্রচলন এখন আর নেই। সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতি-সংস্কৃতি এই সমাজে এমনভাবে প্রবেশ করেছে যে নারী আর নৃত্য-গীতে পুরুষের সঙ্গী হয় না। গম্ভীরা নাচে শুধু পুরুষেরাই অংশী। হুদুমা বা জলমাঙ্গা মেয়েদেরই অনুষ্ঠান—তাই এর নৃত্যে মেয়েরাই একমাত্র অংশ গ্রহণ করেন। বিয়ের আচারে মেয়েদেরই প্রাধান্য। এর গানের সঙ্গে যে নৃত্য তাতে একমাত্র মেয়েরাই অংশী। কাশাই খুড়া বা ভাজার সময় যে গান মেয়েরা করেন তাতে নৃত্যাংশে তারাই নাচেন। বর বরণের সময় মেয়েরাই গান করতে করতে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে পরস্পর কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে কোমরের দোলায় ছোট ছোট পদক্ষেপে নৃত্য করেন। মেয়েদের নাচে কোমরের ওপরের অংশের বা হাতের মুদ্রার বিশেষ কাজ নেই। শুধু মাঝে মাঝে কোমরের ওপর ঘেষে উর্ধ্বাংগ ঝুঁকিয়ে গানের সুরে নাচতে দেখা যায়। ঘাটো-ব, জলমাঙ্গায় এমন নাচ দেখেছি।

পালা-ধরণের নৃত্য-নাট্যে আগে মেয়েরা অংশ গ্রহণ করতেন না। এখন কিছু কিছু মেয়ে অংশ গ্রহণ করছেন। মেয়েদের ভূমিকায় আগে একমাত্র ছেলেরাই অভিনয় করতেন বলে তার নৃত্যশৈলী পৃথকভাবে আলোচ্য। কিন্তু এখানে সে অবকাশ নেই। শুধুমাত্র বলা যেতে পারে 'খেমটা' ধরণের নৃত্যশৈলী এসব পালায় ছোকরা বা ছুকরী অভিনেতাদের মধ্যে দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ, নটুয়া, বিষহরা, সত্যপীর গানের ছোকরা নাচের কথা উল্লেখ্য। এদের পরনে ঘাঘরা বা শাড়ি এবং

ঊর্দ্ধাঙ্গে ব্লাউজ ও একটি ওড়না।

এই ছোকরাদের অভিনয়ে এখন যুগরুচি অনুযায়ী ধীরে ধীরে মেয়েরাই আসছেন। তাঁরা যে নৃত্যশৈলী অনুসরণ করছেন তা ওই ছোকরাদেরই।

এইসব নৃত্যগুলো থেকে যে কটি উপাদান (মোটিফ) পাওয়া যায় তা নিচে দেওয়া হ'ল :

এক. বৃত্ত বা বৃত্তাকার নৃত্য। এই মোটিফ প্রায় সব নৃত্যেই 'সাধারণ'।

দুই. পাশাপাশি দাঁড়িয়ে একটি সরলরেখা সৃষ্টি। তা কখনো অর্ধবৃত্ত বা স্তর রূপ নেয়।

তিন. সমান্তরাল দুটি বা তিনটি রেখার মতো লম্বালম্বি।

চার. স্থান পরিবর্তন, পরস্পরের মধ্যে মিশ্রণ।

পাঁচ. পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণে এগিয়ে পিছিয়ে যাওয়া।

ছয়. মাঝে মাঝে একই সঙ্গে হাতে তালি।

এবার কয়েকটি গানের নমুনা দিয়ে এই প্রসঙ্গের ইতি টানা যাক।

(এক) বন্ধুয়ালা : এই গানের জন্ম ফাল্গুন-চৈত্র মাসের পাথার বা ক্ষেত্রভূমিতে। পশ্চিমা বাতাসের (পচিয়ার বাও) ঝড়ে কৃষক যখন মাঠে লাঙ্গল দেয় বা মই টানে তখনই এই গান বিশাল পাথারে ঢেউ তোলে। যেমন :

পচিয়ায় উড়াল মারো্য ছে রে

অথবা, কাউয়্যারে তুই কেল্‌কেলাইসনা
বাঁশের ছায়ারে পাইয়া
মুই নিরাশী মন কান্দেছে
ঝ্যালমা ভাতার পাইয়া ইত্যাদি

(দুই) মেছেনী : মেয়েদেরই ব্রত। নাচ-গানে ভরা। দেবী তিস্তাই মেছেনী। এই ব্রত উদ্‌যাপিত হয় বৈশাখ মাসে।

তিস্তাবুড়ি নামে রে
বাজে হীরামন বাঁশি রে······

অসংখ্য মেছেনী গানের দুটি ছত্র 'প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত' থেকে উদ্ধৃত করা হলো মাত্র।

(তিন) চোর-চুরনী : কার্তিক মাসে কালীপুজোর সময় এ গান গাঁয়ের ছেলেরা দল বেঁধে করে। একজন সাজে চোর, একজন চুরণী। লোকনাট্যাক্রান্তও বটে এ নাচ-গান।

আমাসী পারবে রে
চোর সান্দাইল্ ঘর রে
পাইকার যদি অহিল হয়
চোরক পিটিয়া ধল্লে হয়। ইত্যাদি

(চার) বেহার গান :

দিনাজপুরের ইশমি চুড়ি
পয়সা পয়সা দাম
খাবার সময় ফম্ (মনে) পড়েছে
(মোর) ফান্নার বন্ধুব নাম।

(পাঁচ) ব-খেলা :

হালুয়া। উঠেক উঠেক বাই ন-দাবী
চাষ করিবা যাছুং মুই ভুরভুসিডাঙ্গি।
অমলপস্তা, মরিচের গুণ্ডা
আর নে যাইস ঘিউ দিয়া মাখিয়া
ওই পাথার বাড়ি।

(ছয়) দোত্রা গান :

ওহো রে দতরা
আজি হতে ভাসিনু রে তোক নিয়া
গলার স্বরে হাতের বেটি বো
মন পাগেলার মন ভুলাইলরে দতরা
আজি হাতে ভাসিনু রে তোক নিয়া।

এই নিবন্ধটি রচনায় সুনীল পালের দুটি লেখা আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছে। তাছাড়া, রাজবংশী সম্প্রদায়ের মেছিনী, চোর-চুরনী ও দোতরার গান 'প্রান্ত উত্তরবঙ্গের লোকসংগীত' থেকে সংগৃহীত। অন্য গানগুলি আমার নিজস্ব সংগ্রহ।

যলিবঘংঠক্কবঃ।

চিত্র সূচী